অন্য পাতায়
গল্প ৩ পাতায়
ধারাবাহিক উপন্যাস
৯ পাতায়
ছন্দে আনন্দে
৮ পাতায়

কিচির মিচির

বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে তথ্য সম্বলিত গোল-গপ্পো ১১ পাতায়। কুইজ্ ৭ পাতায়।

১ বর্ষ ৫ প্রস্তুতি সংখ্যা | ১ জুলাই ২০১৪, ১৬ আষাঢ় ১৪২১ | মোট ১২ পাতা | মূল্য : ১০ (দশ) টাকা

চেষ্টায় বাড়ে একাগ্রতা

ডা. কেদাররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
বিশিষ্ট স্নায়ুমনোবিদ

একাগ্রতা বা মনোসংযোগ। যারা তোমরা পড়াশুনা করো তারা প্রত্যেকেই বিষয়টার সঙ্গে পরিচিত। আমরাও এখানে বিষয়টির সঙ্গে নতুন করে তোমাদের পরিচয় করাতে চাইছি না। আমাদের প্রশ্ন, এই একাগ্রতা বা মনোসংযোগ কি বাড়ানো যায়? এককথায় উত্তর দিতে হলে বলতেই হবে, হ্যাঁ। অবশ্যই বাড়ানো যায়। কিন্তু কীভাবে? সেই বিষয়টাই তোমাদের কাছে আজ আমি হাজির করবো। সঙ্গে দেবো একাগ্রতা বা মনোসংযোগ বাড়ানোর কিছু টিপস্।

আমি যখন ছোটো ছিলাম, মানে যখন আমাকে নিয়ম করে পড়তে বসতে হত তখনই ছিল যত সমস্যা। আর সমস্ত সমস্যা যেন ভিড় করতো পড়তে বসলেই। বিশ্বকাপের সব ম্যাচ তখন আমরা টিভিতে দেখতে না পেলেও ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান নিয়ে আমাদের কম হইচই হতো না। টিভির সমস্যা তখন এখনকার মতো এতটা না থাকলেও, কোনো বন্ধু সিনেমা দেখে এসে তার গল্প বলতো আর পরে সেই গল্প নিয়ে আলোচনা আমাদের মধ্যেও কম হতো না। এখন তো গোটা সিনেমা হলটাই বাড়িতে চলে এসেছে। পড়তে বসলেই কানে ভেসে আসে চেনা গানের সুর বা টিভি সিরিয়ালের সংলাপ। ফলে যা হওয়ার তাই হয়। পড়াশুনাতে মন বসতে চায় না। বিশ্বাস করো, আমারও পড়তে কিছুতেই মন বসতো না। কিন্তু পড়াশুনা তো করতেই হবে। আর যারা তোমরা একটু বড়ো, সামনের বছর মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক দেবে তাদের তো পড়তেই হবে। আমি এখানে কীভাবে এখন থেকে চেষ্টা করলে ধীরে ধীরে মনোসংযোগ বাড়িয়ে পরীক্ষায় নিশ্চিন্ত হয়ে বসা যায় সেই গোপন কথা তোমাদের বলবো।

রসায়ন বা কেমিস্ট্রি বলে একটা বিষয় তোমাদের অনেককেই পড়তে হয়। যারা এখনো সেই পর্যন্ত পড়াশুনাতে পৌঁছাও নি তাদেরকেও ভবিষ্যতে এই বিষয়টি পড়তেই হবে। বলে রাখা ভালো, একাগ্রতার একটাই রসায়ন। সেটি হল, তোমরা যাই করো না কেন, সেটাকে ভালো লাগতেই হবে, সেটাকে ভালোবাসতেই হবে। এই ভালোবাসা বা ভালোলাগা বাড়লেই একাগ্রতা বাড়ে।

শুরুতেই দেখে নেওয়া যাক, কোথা থেকে একাগ্রতা শব্দটার উৎপত্তি। তোমরা সকলেই জানো, একাগ্রতার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Concentration'। এটি একটি ফারসি শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। ভয় পেয়ো না, আমি তোমাদের বাংলা শব্দের বুৎপত্তি বোঝাতে চাইছি না। শুধু ধারণা দেওয়ার জন্যই বলছি।

(এরপর ৪ পাতায়)

ছোটোরা সাবধান ! বড়োরা আসছে !

যশোধরা রায়চৌধুরী
কেন্দ্রীয় সরকারি উচ্চপদস্থ আধিকারিক, কবি

অনেক অনেকদিন আগে পড়েছিলাম, একটা কথা। এক বিশাল পণ্ডিতমানুষ, এরিক ফ্রম, তিনি চাইল্ড হুড অ্যান্ড সোসাইটি নামে একটা বই লিখেছিলেন, আরো অঢেল বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে। মানে, সমাজ আর শিশুরা কিভাবে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে এই ছিল বইয়ের উদ্দেশ্য। এরিক ফ্রম নানা জাতি উপজাতির ইতিহাস খুঁড়ে তুলে এনেছিলেন আফ্রিকা বা লাতিন আমেরিকা অথবা দক্ষিণ এশিয়ার কোনো না কোনো দেশে কী কী ভাবে সন্তান মানুষ করা হয়, কী কী রীতি প্রচলিত। সেই এরিক ফ্রম তাঁর লেখায় বার বার বা বলেছেন তা এইরকম, একটি শিশু কিন্তু আসলে এক পূর্ণাঙ্গ মানুষের ক্ষুদ্র রূপ। কাজেই তাকে ছোটো বলে ছোটো করে দেখার তা প্রশ্নই নেই, বরং শরীর, খাওয়াদাওয়া, অসুখ বিসুখে যেমন অনেক যত্ন থাকে বাবা-মায়েদের, তেমনই তার মনের দিকেও প্রচুর যত্নের প্রয়োজন।

এই যত্নটা কী আতুপুতু? এই যত্নটা কি, ওরে আমার বাছারে, তোকে কখনো দুঃখ দেব না, তুই সবসময়ে আমার চোখে চোখে থাকবি, আর তোর একটু মন খারাপ দেখলেই তোকে চিপস আর চকোলেট কিনে মন ভুলিয়ে দেব-র যত্ন? মশাই, এ যত্ন হল, সচেতনতা, আর স্বাধীনতা দিতে শেখা।

একটি শিশু যখন বড়ো হয়ে ওঠে, তখন তার দিকে বাবা মা সবসময়েই স্নেহান্ধ থাকবেন, এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু স্নেহান্ধতাটা না দেখিয়ে, বরং আড়াল থেকে তার গতিবিধির ওপর নজর রাখাই বরং ভালো। পশু শিকার যাদের উপজীব্য সেইসব ভবঘুরে উপজাতির যে সব সামাজিক নিয়মকানুন বিভিন্ন অ্যানথ্রোপলজিস্ট বা মানবতাত্ত্বিকরা দেখিয়েছেন, তা কিন্তু বলে দেয় যে দশ বারো বছর বয়সেই শিকার, বা অন্যান্য রুজি রুটির সিরিয়াস কর্মে বড়োদের দঙ্গলেই নিয়ে যাওয়া হয় শিশুদেরও। তাদের দেওয়া হয়, অধিকার, বড়োদের সমকক্ষ ভাবার। আবার ভীষণ বিপদের মধ্যে তাদের ঠেলে দেওয়াও নিশ্চয় হয় না। নজর রাখা হয় তাদের সুরক্ষার দিকেও।

বেড়াল কুকুরদের জগতেও দেখব, একটা ছোট্টো বেড়ালছানাকে মরা ইঁদুর এনে দিয়ে মা বেড়াল খেলা দিচ্ছে। মানে খেলার মাধ্যমে আসলে জীবনে বেঁচে থাকার

(এরপর ২ পাতায়)

এভারেস্ট জয়ীর ডায়েরির পাতা থেকে

পর্বতারোহণের সেকাল ও একাল

দেবদাস নন্দী

অভিযানের আনন্দ ...

গত সংখ্যায় আমরা পাহাড়ে চড়ার কিছু উপকরণ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। এই সংখ্যাতেও আমরা আরো কিছু উপকরণ নিয়ে আলোচনা করব।

আমরা যখন এভারেস্ট অভিযান শুরু করেছিলাম তার আগে প্রথম অসামরিক বাঙালি পর্বতারোহী হিসেবে এভারেস্টের চূড়ায় ২০১০ সালেই পা দিয়েছেন দেবাশিস বিশ্বাস। তাঁদের পথেই অর্থাৎ প্রচলিত 'হিলারি-তেনজিং' রুট ধরেই আমরা রওনা হয়েছিলাম।

কলকাতা থেকে কাঠমাণ্ডু। যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে হলেও, আমাদের ক্ষেত্রে সেরকম কিছুই ঘটেনি। কাঠমাণ্ডু থেকে ছোটো প্লেনে লুকলা এখানে প্রচুর দোকানপাট রয়েছে। বেশিরভাগ পর্বতারোহীরাই এখান থেকে সরঞ্জাম কেনেন। বিদেশি পর্যটকদের ভিড় এখানে নজরকাড়া। এখান থেকেই আমাদের ট্রেকিং শুরু। দুধকোশী নদীকে নিচে ফেলে কখনও ডান দিক কখনও বাঁ দিক ধরে এগিয়ে চলা। চলার পথের সৌন্দর্য, রডোড্রেনড্রনের রংবাহার সারা জীবন চোখে লেগে থাকবে। আমাদের সঙ্গের জিনিসপত্তর পৌঁছে গেছে নামচে বাজারে। আমাদের হাঁটা প্রকৃতপক্ষে শুরু প্যানগোচে থেকে। সামনেই নীল আকাশের গায়ে হেলান দেওয়া সাদা বরফে মোড়া নুৎসে রেঞ্জ - নুৎসে ১, নুৎসে ২, নুৎসে ৩। তার পেছনে আমাদের লক্ষ্য মাউন্ট এভারেস্ট দৃশ্যমান। প্যানগোচেতে রয়েছে মনাস্ট্রি, পাশেই চোরতেন। তিব্বতীদের বিশ্বাস অনুযায়ী এই চোরতেনকে ডানদিকে রেখে এগোলে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। সেইভাবেই আমরা জুনিপারের ঝোপকে পাশে রেখে প্রার্থনা-পতাকার বাঁদিক দিয়ে এগিয়ে চললাম খোকলা থেকে লোগুছের দিকে। এই পর্যন্ত পথে কোনো হাই অলটিট্যুড ট্রেকিং সরঞ্জাম না লাগলেও আমাদের সঙ্গে রয়েছে আইওয়্যার বা চশমা, বিশেষ ধরণের জুতো, ক্রাম্পন, পর্বতারোহণের উপযুক্ত জামাকাপড়, টেন্ট, স্লিপিংব্যাগ, খাবার-দাবার। গত সংখ্যায় আমরা হেলমেট, ব্যাকপ্যাক ও আইস এক্স বা বরফ কুঠার নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। এবারে প্রথমেই আসি আইওয়্যার-এর কথায়।

১৯৫৩ সালে হিলারি-তেনজিংরা অ্যাভিয়েটার-স্টাইল গগলস্ ব্যবহার করেছিলেন যা তাঁদের সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি ও স্নো-ব্লাইন্ডনেস থেকে চোখকে রক্ষা করেছিল। হেডস্ট্র্যাপ ও লেন্স গ্যাসকেট মাথার সঙ্গে গগলস্‌কে ধরে রাখতে সাহায্য করতো। ২০১৩ সালে আমরা যে গগলস্ ব্যবহার করি তা স্মিথ অপটিকস্ আই/ও ইন্টারচেঞ্জেবল পোলারাইজড্ গগলস্, যা আমাদের ক্ষমাহীন সূর্যের হাত থেকে চোখকে রক্ষা করে। দ্রুততার সঙ্গে এর লেন্স পরিবর্তন করা সম্ভব বলে হঠাৎ আলোর কমবেশিতে আমাদের কোনো অসুবিধা হয় না এছাড়াও রিমলেস এই গগলস্ 'অ্যান্টি ফগ কোটিং' থাকায় সবকিছু পরিস্কার দেখা যায়।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

ছোটোরা সাবধান ! বড়োরা আসছে !

১ পাতার পর

উপযোগী কাজগুলোর ট্রেনিংই দিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাকে। এভাবেই বাবা-মায়েদের দিক থেকে শিশুকে কিন্তু সমাজেরই একজন, আর সমাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ভাবা হয়। প্রকৃতিই সেভাবে ভাবায়।

কিন্তু আমরা শিক্ষিত উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্তরা তো একটু বেশি বুঝে ফেলেছি, তাই আমাদের শিশুরা অনেকেই আজ মনোরোগী, বিক্ষিপ্ত মনোযোগ, বিক্ষিপ্ত মনোযোগ বা পড়াশোনায় ভালো করতে না পারার তথাকথিত রোগ আমাদের শিশুদের আঁকড়ে ধরেছে। এমনকি ঘটে যাচ্ছে আত্মহত্যার মতো বীভৎস ঘটনাও।

এক্ষেত্রে আমাদের মতো বাবা-মায়ের বোধহয় দুটো সমস্যা। এক, আমরা শিশুদের বেশি আদর করে ফেলি, যতটা তার দরকার নেই। ওই চিপস চকোলেটের ঘুষ দিয়ে তার মন পাওয়ার চেষ্টার মতই ব্যাপার আর কি।

উল্টোদিকে, আমরা তাদের অ্যাবিউজ করি। অর্থাৎ খারাপ ব্যবহার করি, নিজেদের কর্মজগতের চাপগুলো তাদের ওপর চাপিয়ে দিই, নিজেদের ব্যর্থতার বোঝা তাদের ঘাড়ে চাপাই, তাদের সফল হতে বলি নিজের অসাফল্যকে ভুলতে। তাদের সারাক্ষণ পড়তে বলি, খেলতে বা ইচ্ছেমতো কোনো কাজ করতে বাধা দিই। যেটুকু স্বাধীনতা একজন ছোটো আকৃতির পূর্ণাঙ্গ মানুষের দাবিতে তার পাওয়ার কথা, তা কেড়ে নিয়ে তাকে বন্দী করে ফেলি।

এসব ক্ষেত্রে, বাবা-মা বা বড়োরা ভেবে ফেলেন, ও তো শিশু, তাই ওর কোনো বোধ-বুদ্ধি হয়নি, আর কথায় কথায় বাচ্চাটির কথাকে অমান্য করেন, খুঁত ধরেন, তার কোনো মন্তব্য, হয়ত বা যা সত্যিই শিশুসুলভ তা নিয়ে হাসাহাসি করেন, বা তার কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অন্যদিকে তাকান, নেহাতই বালখিল্য প্রশ্ন বলে অবজ্ঞা করেন। অথবা তার সবকিছুই লঘু করে দেখেন।

এই প্রতিটি উপেক্ষা অবজ্ঞা এবং ''অপমান'' কিন্তু শিশুটির বুকে গিয়ে শেলের মতো বেঁধে, তার চরিত্রকে মনকে বেঁকিয়ে-চুরিয়ে দেয়। অধিক 'আহ্লাদ' দেওয়া বা চিপস বা চকোলেট কিনে দিয়ে আদর করে এবং তার পেট-দাঁতের বারোটা বাজিয়ে যতটা না খারাপ করছেন বাবা-মায়েরা, তারচেয়েও বেশি খারাপ করছেন এইসব 'অসম্মান' করে।

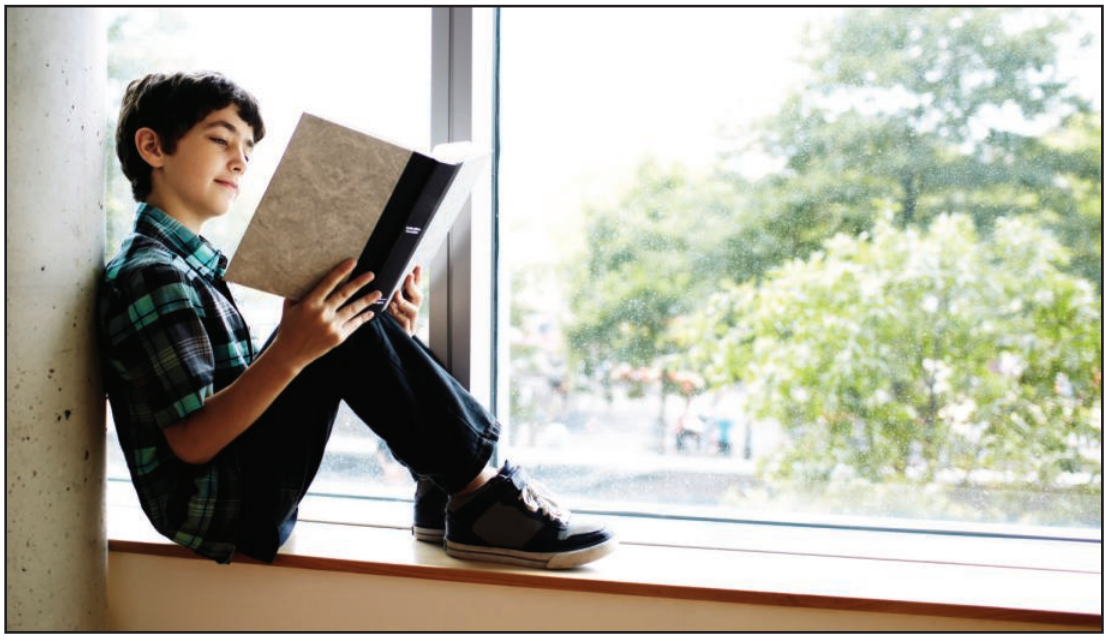

অপমান বা অসম্মান শধটা কেমন বেখাপ্পা শোনাচ্ছে না আমাদের কানে? এই দেখুন, একজন শিশুর ক্ষেত্রে এই শব্দগুলোর ব্যবহারটাই আমরা যেন মেনে নিতে পারি না। একটা পার্সোনালিটি বা ব্যক্তিত্ব হিসেবে তাকে স্বীকৃতি দিতে আমাদের এতটাই বাধে!

অন্যদিকে, পড়াশোনায় অমনোযোগ বা চিত্তচাঞ্চল্য এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা বাবা-মায়েরা অহরহ বাচ্চাদের ওপরে চাপ সৃষ্টি করি, অনুযোগ করি, সোজা ভাষায় ঘ্যানঘ্যান করি। এই পুরো ব্যাপারটাই কিন্তু তাদের অমনোযোগ বাড়িয়ে তোলে। আসলে, মনোযোগের পরিবেশ সৃষ্টি করাটাই আসল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ঘরে টিভি চলছে, খবরের ফাঁকে ফাঁকে উত্তেজক বিজ্ঞাপন চলছে, বাবা-মা ঝগড়া করছেন, নিজেদের মধ্যে। এসবের মাঝখানে একটা বাচ্চা পড়তে বসেছে। খুব কি কাঙ্খিত অবস্থাটা? এরিক ফ্রম-এর কথায় ফিরি। তিনি বলেছিলেন, সুন্দর এক বাক্যে, রেস্টোর সাম প্লে পিস। বলেছিলেন, যখন শিশুরা মন দিয়ে খেলা করে, তখন সেটাও একটা শিক্ষা আসলে। খেলার মধ্যে দিয়েই শিশু শেখে ও বড়ো হয়, ঠিক যেভাবে বেড়াল ছানা ভবিষ্যতে শিকার করার শিক্ষা পা ছোট্টোবেলায় মরা ইঁদুর নিয়ে খেলতে খেলতে। একটা শিশু তার খেলার ঘরে বুঁদ হয়ে বসে খেলা করছে, এই সময়ে বাবা-মা যেন 'ওরে এটা খা, ওরে স্নান করতে যা, ওরে এখন সারাঘরে খেলনা ছড়ালি কেন, ঘর নোংরা হয়ে গেল' এসব বলে উপদ্রব যেন না করেন। বরং তাকে খেলার সময় খেলতে দেওয়াটাই হবে তার যেকোনো ক্রিয়াকর্মে মনঃসংযোগের উপায়।

খেলার সময় তুমি খেল/তারপর খেলা হয়ে গেলে/ পড়ার সময় পড়া করো।

এটুকু স্বাধীনতা কি আমরা দিতে পারি না শিশুদের? আর খেলার শান্তি দিয়ে আমরা কি তাকে পড়ার শান্তির দিকেও নিয়ে যেতে পারি না, ধীরে অতি ধীরে? সাবধানে? যেভাবে সদ্য হাঁটতে শেখা শিশুর হাত ধরে আমরা হাঁটাই?

বিন্নি

শুভেন্দু ঘোষ

দুপুর বেলা ইস্কুল থেকে ফিরেই টুপুরের মনটা খারাপ হয়ে গেল। ও সকালে ইস্কুলে বেরিয়ে যাবার পর থেকেই নাকি বিন্নিকে পাওয়া যাচ্ছে না। ছোটকা গোটা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোথাও বিন্নির হদিস পায়নি। টুপুরের এখন ভীষণ কান্না পাচ্ছে। কোথায় গেল বিন্নি!

টুপুরকে নিয়ে এসেই মা গেছে দোতলায় রান্না ঘরে। একটু পরেই ভাত খাবার ডাক পড়বে। কিন্তু বিন্নিকে না পেলে টুপুরের গলা দিয়ে ভাত একটুকু নামবে না। মায়ের আর কী! বিন্নি এলো বা গেলো-মায়ের ভারি বয়েই গেলো তাতে। স্কুলবাস থেকে নেমে মায়ের সঙ্গে বাড়ি পর্যন্ত এই পথটুকু আসার মধ্যে মা তো বিন্নির প্রসঙ্গ একবারও তুলল না।

অভিমানে একফোঁটা জল বোধহয় গড়িয়ে পড়ল টুপুরের গাল বেয়ে। স্কুলের ইউনিফর্মটা অযত্নসহকারে খুলে কোনোরকমে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলল বিছানার এককোণে। ছুট্টে গিয়ে জুতোর সেল্ফ থেকে স্কুলের জুতোর একপাটি ফেলে দিলো মাটিতে। এগুলো তার নীরব প্রতিবাদ হয়ে ছড়িয়ে থাকুক– মা বুঝুক তার মনের ব্যথাটা।

খাটের তলায় একবার উঁকি দিল টুপুর। অনেক সময় মায়ের তাড়া খেয়ে খাটের নিচে রাখা ট্রাঙ্কটার পিছনে লুকিয়ে পড়ে বিন্নি। আজ সেখানে নেই। পেছনদিকের দরজা খুলে চুপিচুপি একবার বাগানটা দেখে নেবে নাকি। অনেক সময় ওখানে পেয়ারা গাছের ডালে উঠে লেজ ঝুলিয়ে বসে বিন্নি। কিন্তু সেও তো টুপুর সঙ্গে থাকলে তবে। আর তার যত শত্রুতা কাকেদের সঙ্গে। ওদের স্বভাব চরিত্র আর কর্কশ ডাকটা বিন্নির একদম পছন্দ নয়। হাবেভাবে সেটা এতদিন জানিয়েও আসছে সে। তার দৌরাত্মে কাকেদের দেখা পাওয়াই ভার এ বাড়িতে, তবু বিন্নির কদর নেই।

একমাত্র মুশকিল আসান হতে পারত ছোটকা। কিন্তু সেও এখন ইউনিভার্সিটি গেছে। বিকেল গড়িয়ে ছোটকা না আসা পর্যন্ত টুপুর অসহায়। ভাবতে ভাবতেই উপর থেকে মায়ের গলা ভেসে এল– খাবার জন্য ডাক পড়েছে। মাকে ভীষণ ভয় করে টুপুর। যেমন ভয় করে বিন্নি। বাপি অবশ্য বিন্নির ব্যাপারে অল্প-অল্প প্রশ্রয় দিলেও মায়ের কথার প্রতিবাদ করেনা। আর দাদু-ঠাম্মা এ ব্যাপারে মায়ের দলে।

দু'হাতে চোখটা রগড়াতে রগড়াতে খাবার টেবিলে গিয়ে বসলো টুপুর। মুখ ভার দেখে মা একটু ঝাঁঝিয়েই উঠলেন, ‘আপদ বিদায় হয়েছে, বাঁচা গেছে। এ সব বেড়াল টেড়াল নিয়ে আদিখ্যেতার দরকার নেই। পড়াশোনার নামগন্ধ নেই, ঐ বিন্নি কি তোমাকে পরীক্ষার পড়া করাবে! ভালো হয়েছে। এখন ভাতটুকু তাড়াতাড়ি খেয়ে আমাকে উদ্ধার করো। ঠাম্মাও এই সুযোগে বেড়ালের অপকারিতা বিষয়ক নাতিদীর্ঘ উপদেশমূলক বক্তব্য পেশ করে রাখল।

টুপুরের এখন গোটা পৃথিবীকে শত্রুপুরী বলে মনে হচ্ছে। সে রোজ স্কুল থেকে ফেরা মাত্রই বিন্নি যেখানে থাকুক, একবার ‘মিয়াও’ বলে মৃদু সাড়া দেবেই। তারপর টুপুর খাওয়া শেষ করলেই ওর পেছন পেছন গোটা বাড়িময়, এমনকী বাগানেও ঘুরে ফিরে বেড়াবে। টুপুর ওকে কোলে তুলে নিলেই দুষ্টুটা তার কোল থেকে নামতেই চাইবে না। টুপুরের কোলে মুখ গুঁজে চুপ করে থাকবে আর মিটমিট করে দেখবে। কিন্তু কান খাড়া রাখবে, পাখি বা কাঠবেড়ালির সাড়া পেলেই ওর বীরত্ব তখন দেখে কে! টুপুরকেও বিন্নি তখন কিছুটা অগ্রাহ্য করে। কিন্তু পাশের মিতুলদের বাড়ির পোষা ডোবারম্যান ডোডো যদি একবার হাঁক ছাড়ে, অমনি একছুট্টে টুপুরের পায়ের কাছে এসে মুখ ঘষবে, তাকে চটপট কোলে তুলে নেবার জন্য। টুপুরও এই গোটা ব্যাপারটা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে আর হাততালি দিতে দিতে হাসিতে ফেটে পড়ে। তারপর হলদে রঙা সূর্যটা যখন ক্রমশ ফিকে হতে হতে শেষ পর্যন্ত টুপ করে রেলস্টশনের ওপারে পুরনো ভাঙা কারখানাটার পিছনে ডুব দেয় আর ঝুপসি হয়ে অন্ধকার নেমে পড়ে টুপুরদের বাগান ঘিরে, ওরা ফিরে আসে বাড়িতে। একটু পরেই শ্রেয়া মিস এসে পরবেন পড়াতে। তার আগেই হাত-পা ধুয়ে পড়ার ঘরে চলে আসে টুপুর। আর বিন্নিও টুক করে টুপুরের চেয়ারের নিচে ‘পজিশন’ নিয়ে নেয়। আর তার সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র মা যখন এসে মিসের জন্য চা আর টুপুরের জন্য টিফিন নিয়ে ঘরে আসে, তখন একবার ‘মিয়াও’ শব্দে তার ছোট্ট উপস্থিতিটুকু জানান দেয়। ওর মাত্র ছয় মাসের ছোট্ট জীবনে বিন্নি এই সহবতটুকু শিখে নিয়েছে। কিন্তু তাও মা যে কেন ওকে এত অপছন্দ করে কে জানে?

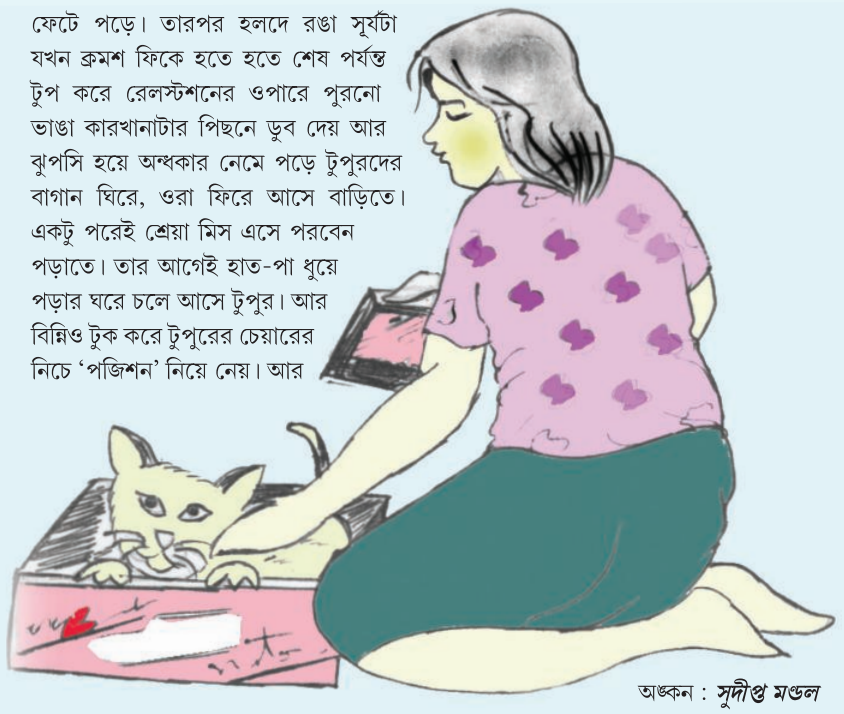

অঙ্কন : সুদীপ্ত মণ্ডল

অভিমানে একফোঁটা জল বোধহয় গড়িয়ে পড়ল টুপুরের গাল বেয়ে। স্কুলের ইউনিফর্মটা অযত্নসহকারে খুলে কোনোরকমে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলল বিছানার এককোণে।

কোনো রকমে শেষ গ্রাসটা মুখে পুরে টুপুর ছুটল ছাদে। বলা যায় না দুষ্টুটা কার্নিসেও উঠে পড়তে পারে, হয়তো নামতে পারছে না! চাপাস্বরে টুপুর ডাকল,‘বিন্নি অ্যাই বিন্নি’! নাহ, কোথাও নেই। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল টুপুরের বুক থেকে। ছাদ থেকে নিচে চারপাশে তাকালো। ঐ একরত্তি চেহারা কি এত উঁচু থেকে নজরে পড়বে!

একটা বেশ মোটাসোটা হুলো বেড়ালকে কয়েক সপ্তাহ ধরে চোখে পড়েছিল টুপুরের। বাগানের পাঁচিলের উপর উঠে গোঁফ নাচিয়ে লেজ ফুলিয়ে খুব সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাঘুরি করছিল। তবে কি.....! আর ভাবতে পারে না টুপুর। দ্রুত পায়ে নিচে নেমে যায় সে। ঠাম্মার ঠাকুরঘরে– নেই। দাদুর ঘরে আলমারির নিচে, বুক সেল্ফের উপর, ইজিচেয়ারের নিচে– নেই। শোবার ঘরে– নেই। বাথরুম, গ্যারাজঘর, পড়ারঘর, ক্যারামবোর্ডের পেছনে, সোফার উপর কোথাও নেই। কোথাও নেই।

টুপুরের পৃথিবীটা যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। যে জিনিসটা যেখানে ছিল, সেখানে ঠিক তেমনই আছে, কোথাও কিছু বদলায়নি, কিচ্ছু কম পড়েনি। শুধু কোথাও বিন্নি নেই।

এবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল টুপুর, আমার একটুও ভালো লাগছে না রে বিন্নি। তুই কোথায়! তুই না থাকলে আমিও অন্য কোথাও চলে যাবো, তুই দেখে নিস। তখন আর আমাকে খুঁজলেও পাবি না। .... তোর লজ্জা করে না! তোকে কীভাবে বাড়ির দরজার বাইরে থেকে দু-দুটো নেড়ি কুকুরের কবল থেকে বাঁচিয়ে এনেছিলাম! মাকে লুকিয়ে ইস্কুল থেকে ফিরিয়ে আনা টিফিন খাইয়েছি কতোদিন! এই সেদিনও .... গোটা স্যান্ডউইচটাই তুলে দিয়েছি তোর মুখে। ...আর তুই কিনা...? এবার হু হু করে কেঁদে ফেলে টুপুর।

‘মিয়াও’, চমকে তাকায় টুপুর। এ নির্ঘাৎ বিন্নির ডাক। ‘বিন্নি-বিন্নি! কোথায় তুই’! অস্থির ভাবে এদিক ওদিক তাকায় টুপুর। তারপর যেদিক থেকে আওয়াজটা এসেছে সেদিকে এগোয়। আবার-‘মিয়াও’। ঐ তো ছুটে যায় টুপুর। পুজোয় কেনা নতুন জুতোর বাক্সর ঢাকনাটা একটু নড়ে উঠল যেন। তাড়াতাড়ি সেটা সরিয়ে ফেলে।.....

...দুষ্টু! দুষ্টু! দুষ্টু! হাত বাড়িয়ে তুলে নেয় একরত্তি বিন্নিকে। পেছনের পায়ে যেন কিসের আঘাত! রক্তের দাগও রয়েছে সামান্য। জানি না কোত্থেকে চোট পেয়েছে বেচারি, আর ভয় পেয়ে লুকিয়েছে নিরাপদ আশ্রয়ে। জখম হয়ে একেবারে নির্জীব হয়ে গেছে। ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় টুপুর। ওকে বুকে চেপে ধরে ওপরে ছুটল টুপুর। ‘মা-ঠাম্মা-দাদু! এই যে বিন্নি’! উফ আবার ওরা! হুলো বেড়ালের খপ্পর থেকে বেরিয়ে আবার আরো এক বিপত্তি! টুপুরকে আরো জোরে আঁকড়ে ধরে বিন্নি। এই একটা জায়গা, যেটা পৃথিবীতে তার পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ।

‘মা একটু ওষুধ দাও তো, ওর খুব লেগেছে’। শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে যায় টুপুর।

চেষ্টায় বাড়ে একাগ্রতা

১ পাতার পর

এই ‘Concentration’ শব্দটির প্রথম অংশটি অর্থাৎ ‘Con’ শব্দের অর্থ ‘এক’ এবং পরের অংশ ‘Center’ শব্দের অর্থ ‘কেন্দ্র’। এই থেকে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি, যে কোনো অবস্থাতেই নিজের ‘আত্মা’ এবং ‘মেধা’কে একত্রিত করাই একাগ্রতা। জটিলতায় না গিয়ে এসো দেখে নিই, কোন কোন অবস্থায় একজনের একাগ্রতার অভাব ঘটতে পারে।

১) বিশেষ কাজের চাপ সহ্য করতে না পেরে; পরীক্ষার আগে অতিরিক্ত স্নায়ুর চাপে পড়াশুনা না হওয়া।

২) কাজ শুরুর আগেই ফলাফল জেনে গেলে; অনেক খেলাই গড়াপেটা হয়, তখন খেলার মান একাগ্রতার অভাবেই খারাপ হয়।

৩) ‘পারফরমেন্স অ্যাংজাইটি’। পরীক্ষা দিতে বসে সব কিছু ভুলে যাওয়া বা সব গুলিয়ে যাওয়া, মনোসংযোগের অভাব।

৪) কোনো কাজ এড়িয়ে চলতে চাইলেও বাধ্য হয়ে সে কাজ করতে হলে; পড়তে বসতে ইচ্ছে করছে না কিন্তু বাবা-মায়ের জন্য বসতেই হলে।

৫) শেষ মুহূর্তে কাজ করার মানসিকতা। ‘স্টেজে মেরে দেবো’ এই লক্ষ্য সময়ে সময়ে দুশ্চিন্তার জন্ম দেয়, একাগ্রতার অভাব ঘটে। অবশ্য যারা এই ভাবে কাজ করে অভ্যস্ত তাদের এতে একাগ্রতা বাড়ে। তবে এই মানসিকতা ভাল নয়।

৬) কোনো কাজ সম্পর্কে আগের কোনো ধারণা না থাকলে আত্মবিশ্বাসের অভাব ঘটে, একাগ্রতা কমে। ক্লাস সিক্সের এক পড়ুয়াকে কো-অর্ডিনেট জিওমেট্রি বোঝাতে শুরু করলে পড়ুয়ার মনোসংযোগ না থাকাটাই স্বাভাবিক।

এ ছাড়াও উদ্যমের অভাব, পরিকল্পনার অভাব, শব্দদূষণে একাগ্রতা কমে। শারীরিক সমস্যা বা অসুস্থতাও একাগ্রতা কমায়। বলে রাখা ভালো যে, আমি ধরেই নিয়েছি তোমাদের কোনো শারীরিক সমস্যা নেই।

তাহলে তোমরা পড়াশুনার সময়ে একাগ্রতা আনবে কী করে? এখানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে রাখি। প্রথমত, একাগ্রতা কেন আসছে না সেই কারণটাকে খুঁজে বার করো। কী কী কারণে একাগ্রতা কমে বা আসে না সে কথা আমি আগেই বলেছি। দ্বিতীয়ত, কারণ খুঁজে বার করার পরে নিজেই ভাবো কীভাবে সেটিকে কাটিয়ে ওঠা যায়। প্রয়োজনে বড়োদের সাহায্য নাও।

আমি দেখেছি, আমরা যখন পড়াশুনা করতাম তখনকার সঙ্গে এখনকার একাগ্রতা নষ্ট হওয়ার কারণ অনেকক্ষেত্রেই এক। এসো মিলিয়ে নেওয়া যাক।

প্রখর অনুভূতিপ্রবণরা একটু আনমনাই হয়। আর তাঁরাই পারেন কিছু ছাপ রেখে যেতে। তাই বলি, মনোযোগী না হওয়াটা কোনো অন্যায় নয়, বরং তুমিও পারবে কিছু করতে। হ্যাঁ পারবেই।

ক) টিভি, ইজিচেয়ার, লোকজন। ঘর ভর্তি। পড়বো কোথায়?

সমাধান- ইজিচেয়ার সরাও। পারলে বাড়িতে আলাদা পড়ার ঘর/নিজের ঘর থাকলে সেখানে পড়তে বসো।

খ) পড়ার সময় গান-বাজনা, অন্যদের কথাবার্তা।

সমাধান- নিরিবিলিতে গিয়ে পড়ো। পড়ার সময় বদলাও। নিরিবিলি সময় বেছে নাও।

গ) পড়তে বসলেই ঝিমুনি।

সমাধান- যখন সজাগ থাকবে তখন পড়ো। সঠিক নিয়ম মেনে ঘুমাও। বেশি প্রোটিন আছে এমন খাবার পরীক্ষার সময়ে ভালো। ভোরবেলা শরীরচর্চা একেবারে মাস্ট।

ঘ) বিরক্তি, পড়াশুনায় অনীহা।

সমাধান- কারণ খুঁজে বের করো। প্রয়োজনে বন্ধু, শিক্ষক, বাড়িতে বাবা-মায়ের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলো।

ঙ) পড়তে বসলেই ভয়, উদ্যমহীনতা।

সমাধান- গোটা পড়াটাকে কয়েকটা ছোটোভাগে ভাগ করে পড়ো। যেটাতে সবথেকে বেশি ভয় সেটা আগে পড়ো। নিজেকেই নিজে শাস্তি/পুরস্কার দেওয়ার নিয়ম চালু করো।

চ) ভুলভাল চিন্তা।

সমাধান- ঘরে বসে থাকলেই একাগ্রতা বাড়ে না। ভুলভাল চিন্তা সরিয়ে একাগ্রতা বাড়াতে ইন্ডোর গেমসের জুড়ি নেই। বিশেষত, দাবা, ‘জিগ্‌ পাজল্’, সুতোয় পুতি গাঁথা, কাগজ কেটে নকশা বানানো বা বিভিন্ন প্রকারের হবি একাগ্রতা বাড়ায়। বই পড়লে ভুলভাল চিন্তা কম আসে, একাগ্রতা বাড়ে। কারণ টিভি দেখা বা গান শোনায় নিষ্ক্রিয় বা অলস মনোযোগ লাগে। বই পড়ায় চাই সক্রিয় মস্তিষ্কের ব্যবহার।

সোজা কথায় –

✓ লেখার অভ্যেস করো। পড়েই লিখে ফেললে কিছুটা বেশি মনে থাকে। সম্ভব হলে পরদিন আবার সেই বিষয়টি লেখো। মিলিয়ে নাও। যত বেশি মিলবে তত বেশি বিষয়ের প্রতি ভালোবাসা-ভালোলাগা বাড়বে, একাগ্রতাও বাড়বে।

✓ পড়ার বই ছাড়া ভালো বই পড়ার অভ্যাস করো।

✓ নিজের দুর্বলতা নিজেই খুঁজে বার করো। দুর্বল স্থানে জোর দাও। বেকহ্যাম প্রতিদিন হাজারটি ফ্রি-কিক নেওয়া অভ্যাস করতেন। সেখান থেকেই এসেছে একাগ্রতা ও লক্ষ্যভেদের নিশ্চয়তা।

✓ আবেগ দূরে সরিয়ে পড়াশুনায় বসো।

✓ উদ্বেগ টেনশন কমাও। শরীরচর্চায় জোর দাও। দাবা খেলো।

✓ কাজের পরিমাণের চেয়ে মানকে বেশি গুরুত্ব দাও। প্রথমে বেশি কাজ করতে হবে, ধীরে ধীরে মানও বাড়বে।

পড়তে বসার গাইড –

📖 ভোরবেলা ও সন্ধেবেলা পড়তে বসার আদর্শ।

📖 পড়ার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা বেছে নাও। কখনোই বিছানা বা আরামদায়ক চেয়ার নয়।

📖 পড়ার জায়গায় চেয়ার-টেবিল ছাড়াও যথেষ্ট পরিমাণে যেন আলো হাওয়া আসতে পারে।

📖 পড়ার ঘরের উষ্ণতা ২১-২৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে থাকলে ভালো।

📖 ফোন, স্টিরিও, বেশি কথা বলা বন্ধুকে পড়ার ঘরে নয়

📖 একটানা না পড়ে ধাপে ধাপে পড়ো।

📖 পড়ার জায়গায় ‘হোয়াইট বোর্ড’ লাগাও। সেখানে আগেই লিখে রাখো কী পড়বে, পড়া হলে কেটে দাও।

📖 ইচ্ছে না করলে বা বিরক্তি এলে তখন পড়বে না।

📖 পড়তে বসে একাগ্রতার অভাব টের পেলে একটা নোটবুকে একাগ্রতা নষ্টের তারিখ, সময় ও কারণ লিখে রাখো। সপ্তাহ-খানেক পরে মেলাও। দেখো একাগ্রতা নষ্টের কারণ কী কী, কোনটা বেশি সমস্যা করেছে, ক্রমশ বাড়ছে না কমছে। সেই অনুযায়ী পরের কাজের সিদ্ধান্ত নাও।

📖 পড়তে বসে একাগ্রতার অভাব বুঝতে পারলে বিশ্রাম নাও, বা পায়চারী করো। বিশ্রামের সময় যন্ত্রসঙ্গীত, শ্লোক চোখ বুজে শুনতে পারো।

📖 চিন্তার জন্য আলাদা সময় রাখো। পড়তে বসে চিন্তা নয়। আগেই চিন্তা করে, পরিকল্পনা করে পড়তে বসো।

(এরপর ৬ পাতায়)

স্বপ্ন দেখতে শেখো

ড. মৌসম মজুমদার

জীবনে সফল হওয়ার জন্য প্রত্যেকের মনে একটা স্বপ্ন থাকা ভীষণ প্রয়োজন। আবার ড. আব্দুল কালাম বলেছিলেন, ‘স্বপ্ন সেটা নয়, যেটা মানুষ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখে। স্বপ্ন সেটাই যেটা মানুষকে ঘুমোতে দেয় না।’ প্রত্যেকেরই উচিত নিজের প্রতিভাগুলিকে নিজেই আবিষ্কার করে তার বিকাশ ঘটানোর আপ্রাণ চেষ্টা করা। নিজের মনের লালায়িত স্বপ্ন সফল করার জন্য শুরু করতে হবে নিরন্তর অভ্যাস। ইচ্ছাশক্তি বা ঢউইলপাওয়ার হল যে কোন মানুষের সফলতার চাবি কাঠি। এভারেস্ট জয়ী প্রতিবন্ধী অরুণিমা সিং, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বক্সার মেরি কম, যুবরাজ সিং, সের্গেই বুবকা, শাহরুখ খান, ছন্দা গায়েন প্রমুখ প্রত্যেকেই কিন্তু ইচ্ছাশক্তি আর পরিশ্রমের জোরেই সাধারণ থেকে অসাধারণ হয়ে উঠেছেন। পরিকল্পনা রচনা, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সবার প্রথমেই প্রয়োজন মানসিকভাবে সৎ মানুষ হওয়া। সততাই সফলতাকে আহ্বান জানায়। আর প্রয়োজন মনোসংযোগ। ছাত্রাবস্থা থেকেই মনোসংযোগ বাড়ানোর জন্য সাঁতার, যোগব্যায়াম, অনুলোম-বিলোম, কপালভাতি প্রাণায়াম, শীর্ষাসন, বজ্রাসন প্রভৃতি নিয়মিত অভ্যাস করতে হবে। আর রাত জেগে না পড়ে রাত্রি ১০টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে ভোরে ওঠার অভ্যাস করলে স্মৃতিশক্তি বাড়বে। যদি সম্ভব হয় সারাদিনে একবার পড়ার ঘরে দরজা জানলা লাগিয়ে আবছা অন্ধকারে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে তার শিখার দিকে ১০-১২ মিনিট তাকিয়ে থাকতে হবে। এটা না পারলে পড়ার টেবিলের সামনের দেওয়ালে সাদা কাগজে কালো স্কেচপেন দিয়ে ছোট্ট বিন্দু এঁকে ঐ বিন্দুর দিকে ১০-১৫ মিনিট তাকিয়ে থাকা মনোসংযোগ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। পড়ার আগে চোখ বন্ধ করে প্রতিদিন ২০-২৫ বার ‘ওম’ ধ্বনি উচ্চারণেও মনোসংযোগ বৃদ্ধি পায়।

বিখ্যাত হতে হলে সমালোচনা সহ্য করতে হবে। সমালোচকরাই হচ্ছে আসল বন্ধু। অহং যেন কোনোদিনই মনের মধ্যে না আসে। অহংকার মনোসংযোগকে বিঘ্নিত করে, পতনকে ত্বরান্বিত করে। মাটিতেই পা রেখে আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন সফল করাই হল আসল সফলতা। আর শেষে বলি, সম্মান পেতে হলে বা সম্মানীয় ব্যক্তি হতে গেলে অন্যদের সম্মান দিতে শিখতে হবে। নিয়ম করে বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব-সহ বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী ও বাণী পাঠ করতে হবে।

গুপ্তধন

লক্ষ্মীনারান

শিবনাথ শাস্ত্রী

লক্ষ্মীনারান এক বামনের ছেলে। দেহটি কুস্তির পালোয়ানের মতো, কিন্তু মাথাটি যেন একটি ছোটো হুঁকার খোল। কাজেই লক্ষ্মীনারানের বুদ্ধিশুদ্ধি বড় কম। কিন্তু তার মা সেকথা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, 'আমার লক্ষ্মীর পেটে-পেটে বুদ্ধি আছে, বয়স হলে ফুটবে।' কবে যে লক্ষ্মীর বয়স হবে তাহা তো বুঝিতে পারা যায় না, দেখিতে দেখিতে বিশ-বাইস বৎসর হইয়া গেল তবুও লক্ষ্মীর বয়স হইল না; সে সংসারের কোনো কাজেই আসিল না। কাজের মধ্যে গরুর খড় কাটে ও প্রাতে গরুগুলিকে গোয়াল হইতে বাহির করিয়া নাড়িয়া বাঁধে। বলিতে কি লক্ষ্মীনারা ঐ গরুগুলিকেই অনেকটা আপনার মতো দেখিতে পায়; এবং ঐ গরুগুলির সঙ্গেই তার যা বনে। নতুবা পাড়ার ছেলেদের জ্বালায় সে পাড়ায় বাহির হইতে পারে না। বাহির হইলেই যেমন কাকের পিছে ফিঙ্গে লাগে, তেমনি ছোঁড়ারা তার পিছে লাগে; এবং বিধিমতে তাহাতে জ্বালাত করে। পিছন দিক দিয়া আসিয়া তাহার কাছা খুলিয়া দেয়, তার হুঁকার খোলের মত মাথাটিকে ঠোকর মারে, তার দুই কাঁধে হাত দিয়া লাফাইয়া ঘোড়া-চড়ার মত তার পিঠে চড়িয়া বসে। কারণ লক্ষ্মীনারানকে ক্ষেপাইতে সকলে ভালবাসে; সে ক্ষেপিলে খোনা নাকে, যেসব গালাগালি দেয় ও তার আকৃতি-প্রকৃতি যেরূপ দাঁড়ায় তা দেখিলে হাসিয়া পেটের নাড়িতে ব্যথা হয়।

লক্ষ্মীনারান বোকা বলিয়া তার পিতা তাকে একেবারেই আমলে আনেন না। তাকে বাদ দিয়া সংসারের কাজ করেন; কোনো কাজের ভার তার উপর দেন না। এজন্য পতি-পত্নীতে বড় বিবাদ হয়। লক্ষ্মীর মা বলেন, 'এক আধটু সংসারের ভার না দিলে ছেলেটা মানুষ হবে কী করে? তোমরা ওকে চেন না, ও আমার মনে করলে দশ টাকা আনতে পারে।'

লক্ষ্মীর পিতা বলে, 'হ্যাঁ যা নয় তাই, ওকে আবার কাজের ভার দেব? ওটা কী মানুষ?'

লক্ষ্মী যখন এই সকল কথা শোনে, তখন মায়ের বাক্যে সায় দিয়া মনে-মনে ভাবে, আমি কি না করতে পারি। লক্ষ্মী কিন্তু সংসারের একটা কাজ করে, গরু দুহিয়া থাকে।

একবার বাড়িতে একটা কাজ উপস্থিত। দশ জন লোক খাবে। সকাল-সকাল প্রথম বাজারে যাইতে পারিলে ভাল জিনিস পাওয়া যায়। লক্ষ্মীর পিতা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন কাহাকে বাজারে পাঠান। তিনি নিজে নানা কাজে পড়িয়া যাইতে পারিতেছেন না। লক্ষ্মীর মা বার-বার বলিতেছে, 'একটু বেলা হলে না হয় তুমি যেও, এখন না হয় লক্ষ্মীকে পাঠাও না কেন?'

কর্তা মহাশয় দুই-চারিবার বলিলেন, হ্যাঁ লক্ষ্মী যাবে, ও গিয়ে করবে কী?' কিন্তু শেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া লক্ষ্মীকে ডাকিলেন, 'লকে, লকে এদিকে আয়; এই একটা টাকা নিয়ে বাজারে যা; আট আনার মাছ কিনে কারুর হাতে পাঠিয়ে দিস; তারপর প্রথম হাটে ভাল তরি-তরকারি যা পাবি কিনে আনিস।'

আজ লক্ষ্মীনারানকে দেখে কে? টাকাটি ট্যাঁকে গুঁজিয়া, দুই হাত দুলাইয়া গরবে-গরবে পা ফেলিয়া বাজারের দিকে চলিল। পথে যদি বালকেরা ডাকে, 'কিরে লকে কোথায় যাচ্ছিস?' উত্তরই দেয় না, ফিরেও তাকায় না, যদি কেহ ভদ্রভাবে বলে, 'কি ভাই লক্ষ্মীনারায়ণ কোথায় যাচ্ছ?' তবে উত্তর দেয়, 'বাঁজারে যাঁচ্ছি, মাঁছ কিনতেঁ।' ঘটনাক্রমে লক্ষ্মীনারান যেই বাজারে উপস্থিত অমনি এক মেছনি এক চুপড়ি কৈ মাছ আনিয়া নামাইল। খুব বড়-বড় কৈ দেখিয়া লক্ষ্মীর জিভে জল আসিল। একথা না বলিলেও সকলের বোঝা উচিত যে লক্ষ্মীনারান আর কিছু না পারুক, খাইতে বেশ পারিত এবং দেখিয়াছে মা তাহাকে বড়-বড় কৈ মাছের ঝোল করিয়া খাওয়াইতে ভালবাসেন। সুতরাং কৈ দেখিয়া লক্ষ্মীর মনে হইল কৈ মাছ কিনিতে হবে। লক্ষ্মী জেলের মেয়েকে বলিল, 'আঁট আঁনার কৈ দাঁও', এই বলিয়া টাকাটি তাহাকে দিল। মেছুনি যাহা দিল তারা লইয়াই লক্ষ্মী চলিয়া যায়, আট আনা যে ফিরিয়া লইতে হইবে, সেদিকে খেয়াল নাই। জেলের মেয়ে নিজের গরজে ডাকিয়া ভাঙ্গানি পয়সা ফিরাইয়া দিল। তখন লক্ষ্মী বলিল, 'তাঁই তো তরি-তঁরকারি কিনতে হঁবে।' এখন মাছগুলি বাড়িতে পাঠাইতে হইবে। কাকে দিয়া পাঠাবে? লক্ষ্মী চেষ্টা করিলে বাজারের চেনা চাষালোক ঢের পাইত যাহাদের কাহাকেও দুইটা পয়সা দিলে বাড়িতে পৌঁছাইয়া আসিতে পারিত। লক্ষ্মী যখন কোনো কর্তব্য নির্ধারণ করিতে বসিত, তখন যদি কোনো একটি বিষয় স্মরণ হইত, তাহা হইলেই অনেক সময় বিপদ ঘটিত। তখনি একটা নতুন আজগুবি বুদ্ধি যোগাইত এবং সে তৎক্ষণাৎ কাজে তাহা না করিয়া থাকিতে পারিত না। তার এই উদ্ভাবনী শক্তিতে সময়ে-সময়ে মুশকিল বাঁধাইত। তাহার প্রমাণ এখনি পাইবে। সে দেখিল মাছগুলি জীয়ন্ত আছে। অমনি স্মরণ হইল যে উজুইয়ের কৈ কানে হাঁটিয়া জল হইতে ডাঙায় উঠে। সেই কথা স্মরণ হইয়া হঠাৎ এ নতুন বুদ্ধি তাহার মনে যোগাইল। তাদের বাড়ি হইতে বাজার পর্যন্ত একটি খালের মত ছিল। সে ভাবিল, মাছগুলি খালে দিলে তো আমাদের ঘাটে উঠিতে পারে। অমনি সে খালের জলে মাছগুলি ছাড়িয়া দিয়া বলিল, 'সোঁজা আঁমাদের ঘাঁটে গিঁয়ে উঠবি।'

মাছ তো পাঠানো হইল। তারপর লক্ষ্মী বাজারে প্রবেশ করিল। যেই প্রবেশ করা অমনি দেখিল, এক কুম্ভকার এক বাজরা কলিকা নামাইতেছে। স্মরণ হইল যে গৃহে ক্রিয়াকর্ম হইলে হুঁকা প্রভৃতি কেনা হয়। পিতা তরি-তরকারি কিনিতে বলিয়াছিলেন। লক্ষ্মীনারানের শাস্ত্রে কলিকাগুলিও তরি-তরতারির মধ্যে, সুতরাং তৎক্ষণাৎ আট আনা দিয়া এক বোঝা কলিকা কিনিয়া লোকের মাথায় দিয়া গৃহাভিমুখে চলিল। আজ সে পিতাকে পরাস্ত করিবে। দেখাইবে সে কেমন কাজের ছেলে, তাই আবেগে চলিয়াছে। পথে যদি কেহ ডাকে বা দাঁড়াইতে বলে, দাঁড়ায় না, বলে 'আঁমি বাঁজার কঁরে যাঁচ্ছি, ঘঁরে কাঁজ আছে।'

শিবনাথ শাস্ত্রী (৩১ জানুয়ারি, ১৮৪৭- ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯১৯) তৎকালীন সময়ের একজন প্রখ্যাত পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ, লেখক এবং ইতিহাসবিদ। ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দেওয়ার অপরাধে তাঁর পিতা তাঁকে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করেন। ১৮৭২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে এম এ পাশ করেন। পরবর্তী কালে কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে বিরোধিতা করে স্থাপন করেন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ। আনন্দমোহন বোসের সঙ্গে একযোগে স্থাপন করেন সিটি স্কুল-সিটি কলেজ। তিনিই ছিলেন প্রথম পরিচালন সমিতির সম্পাদক। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের পত্রিকা 'তত্ত্বকৌমুদী'-র সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেছেন তিনি। ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়, পাটনাতে রামমোহন রায় সেমিনারির প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন তিনি। ১৮৭৬ সালে 'ভারতসভা' প্রতিষ্ঠা হলে তিনি ছিলেন পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য। ১৮৭৫ সালে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গেও দেখা করেন তিনি। 'হিস্ট্রি অফ ব্রাহ্ম সমাজ', 'মেন আই হ্যাভ সিন', 'পুষ্পমাল্য' (কাব্যগ্রন্থ), 'মেজবউ' (উপন্যাস), 'নির্বাসিতের বিলাপ' (কাব্যগ্রন্থ), 'ছায়াময়ী পরিণয়', 'নয়নতারা', 'আত্ম চরিত', 'ইংল্যান্ডের ডাইরি', 'ছোটদের গল্প' ইত্যাদি বহু লেখালেখি তিনি করেছেন।

বাড়িতে পৌঁছিয়া তার কি দশা হইল, সকলেই বুঝিতে পার। ঘরের কাজকর্ম কোথায় রহিল। পতি-পত্নীতে ঘোর বিবাদ বাঁধিয়া গেল।

ইহার পরে লক্ষ্মীনারানের পিতা আর তাকে কোনো কাজকর্মের ভার দিতেন না। আবার বহুদিন কাটিয়া গেল আবার একবার গৃহে কাজকর্ম উপস্থিত। অনেকগুলি লোক খাওয়ানো হইবে। তৎপূর্বদিন গোয়ালাকে আট আনা বায়না পাঠাইয়া আধ মন দই পাঠাইবার জন্য বলিতে হইবে। পিতা ভাবিলেন এত বাজার করা নয়, কেবল গোয়ালার বাড়িতে গিয়া আট আনা পয়সা দিয়া আসা বৈ তো নয়, তা কি আর লক্ষ্মীনারান পারিবে না? ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি লক্ষ্মীনারানকে ডাকিয়া বলিলেন, 'লকে! এদিকে আয় তো। এই আট আনার পয়সা অমুক গোয়ালাকে দিয়ে বলে আয় কাল প্রাতে আধ মন দই দিতে হবে।'

আবার লক্ষ্মীনারানের মাথা ঘুরিয়া গেল। সে আট আনা পয়সা পকেটে গুঁজিয়া বাহির হইল। পথে যাইতে যাইতে দেখিতে পাইল যে রাজাদের একটা হাতি আসিতেছে। হাতি দেখিয়া লক্ষ্মীনারানের হাতি চড়িতে বড় সাধ হইল। মাহুতকে বলিল, 'মাঁহুত হাতি চঁড়াবি?'

মাহুত দেখিল বোকা বামনের ছেলে, জিজ্ঞাসা করিল, 'কী দিবে?'

লক্ষ্মীনারান বলিল, 'আঁট আঁনা দিঁব।' মাহুত ভাবিল বেশ তো উপরি লাভ জুটিল। সে তৎক্ষণাৎ হাতি বসাইয়া লক্ষ্মীনারানকে উপরে তুলিয়া লইল। হাতি যখন চলিতে আরম্ভ করিল তখন যদি লক্ষ্মীনারানের ভাব কেহ দেখিত, তখন নিশ্চয় পাগল হইত। রাজপুত্রই বা কোথায়? এমনই গৌরবে বসিয়াছে। পথে বালকদের কোলাহল, 'ওরে ভাই! লকে হাতির উপর চলেছে। ওরে লকে! হাতির উপর কী করে চড়লি?' লক্ষ্মীনারান কাহারও কথা শুনিতেছে না, কোনো দিকে দেখিতেছে না। কেবল আপনাকে রাজপুত্র ভাবিতেছে। তার ছোটো মাথাটি একেবারে ঘুরিয়া গিয়াছে।

মাহুত কিয়দ্দূর গিয়া লক্ষ্মীনারানকে নামাইয়া দিল। তখন দৈ-এর বায়নার কথা লক্ষ্মীনারানের মনে হইল। অগ্রেই বলিয়াছি তার উদ্ভাবনী শক্তি আশ্চর্য, একটু ভাবিয়াই এমন একটা কৌশল বাহির করিল, যাহা শুনিলে, তোমরা তাহার বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবে না। সে অনেকবার স্মরণ করিয়া মনে-মনে একটি উপায় স্থির করিয়া বাড়িতে ফিরিয়া আসিল। সন্ধ্যার পর ভাঁড়ার হইতে তেঁতুল লইয়া গোয়ালে প্রবেশ করিয়া সমুদয় গরুক তেঁতুল খাওয়াইয়া দিল।

রাত্রে পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওরে লকে, গোয়ালার বায়না দিয়েচিস তো?' লক্ষ্মী উত্তর দিল, 'হঁবে হঁবে, ভঁয় পাঁও কেন? ঠিক সময় পেলেই তো হঁল।' পরদিন প্রাতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ জমিতে লাগিলেন, বাজার হইতে সন্দেশ প্রভৃতি আসিল, দই আর আসে না। পিতা ব্যস্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। 'ওরে লকে! দই কৈ? বায়না দিয়েছিল তো? শেষে লক্ষ্মীনারান বিরক্ত হইয়া জননীকে বলিল, 'আঁ তোঁমরা জ্বালাতন কঁরে তুললে। ভাঁড়টা দাঁও তোঁ দৈঁ দুয়ে আনি।' শুনিয়াই তো জননী অবাক। বলিল, 'দই দুয়ে আনবি কিরে?' লক্ষ্মী উত্তরে বলি, 'ওগো কাল রাত্রে সব তেঁতুল খাইয়ে রেখেছি।'

বুঝিতে পার ব্যাপারটা কি দাঁড়াইল। গৃহকর্তা পাগলের মত হইয়া উঠিলেন। দাঁতে দাঁতে ঘষিতে লাগিলেন, 'ওরে হতভাগা, ওরে লক্ষ্মীছাড়া, আট আনা পয়সা সে দিলাম তার কী করলি?' *(এরপর ৬ পাতায়)*

বিজ্ঞানের খবর

ন্যানো ছাঁকনি রুখবে দূষণ

অপরাজিত বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বের বেড়ে চলা তাপকে ন্যানো প্রযুক্তি দিয়ে ঠেকাতে উদ্যোগী হয়েছেন হলদিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের তিন ছাত্র। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, ইস্পাত কারখানা কিংবা তেল শোধনাগার থেকে বেরোতে থাকা কালো ধোঁয়ার বিষকে কমাতে পথও দেখালেন আগামী দিনের তিন বিজ্ঞানী।

ঘন কালো ধোঁয়ার মধ্যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড'কে ছাঁকতে চিমনিতে ন্যানো ফিল্টার ব্যবহারের খোঁজ দিয়েছেন ঐ তিন ছাত্র। কাগজে কলমে নয়, একেবারে হাতেকলমে তাঁরা দেখিয়েও দিয়েছেন ঐ ফিল্টার বা ছাঁকনি কী করে বানানো যায়। শিল্পে ব্যবহৃত ফিল্টার প্রযুক্তির একেবারে উলটো পথে হেঁটে হলদিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রদের নয়া খোঁজ দারুণ আশা জাগিয়েছে। তাঁদের আবিষ্কৃত ন্যানো ছাঁকনি ব্যবহারিক দিক থেকেও বেশ কার্যকরী, সাশ্রয়কারী আর টেঁকসই। যেকোনো কারখানায় লম্বা চিমনিতে সহজে এই পরিবেশ বান্ধব ছাঁকনিকে বসানো যেতে পারে। খরচও বেশ কম। হলদিয়ার ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির তৃতীয় বর্ষের ছাত্র থাকার সময় ন্যানো ছাঁকনি তৈরির কথা মাথায় আসে। তারপরেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা। যার মোট ফল 'ন্যানো মেমব্রেন'।

প্রযুক্তি ছাত্রদের দাবি বিশ্বের তাপমান বৃদ্ধির জন্য কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে সকলে দায়ি করলেও তা থেকে বাঁচার উপায় নিয়ে তেমন করে গবেষণা হয়নি।

পরিবেশ এই ভাবেই দূষিত হচ্ছে

পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্বে সর্বমোট যে পরিমান কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়, তার এক তৃতীয়াংশ তৈরি করে শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র থেকে। এরমধ্যে প্রথমে রয়েছে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো। উষ্ণায়নের (গ্লোবাল ওয়ার্মিং) ভয়াবহ পরিস্থিতির কবলে এখনই পড়েছে বিশ্ব। তা কুফল ফলতে শুরু করেছে। সামুদ্রিক ঝড়ের বাড়বাড়ন্ত, ভূমিকম্প কিংবা জলবায়ুর পরিবর্তন তারই রূপভেদ মাত্র। বিজ্ঞানীদের মতে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঘনঘটা আরো বাড়বে ঐ পৃথিবীর বেড়ে চলা তাপের জন্য। বিশ্ব উষ্ণায়ন কিংবা গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর মূল কারণ যেহেতু কার্বন-ডাই-অক্সাইড তাই এর কুফল ঠেকাতে বিজ্ঞানীদের দাওয়াইয়েরও শেষ নেই। গোটা বিশ্ব জুড়েই চলছে এই গবেষণা। ঐ সুদূর প্রসারিত চিন্তার নয়া রাস্তা খুলে দিয়েছেন হলদিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের তিন ছাত্র - সায়ন চক্রবর্তী, সায়ন সাহা এবং সৌরভ চট্টোপাধ্যায়। সায়ন চক্রবর্তী আর সায়ন সাহা দুইজন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের চতুর্থ বছরের ছাত্র। সৌরভ চট্টোপাধ্যায় পড়েন একই বর্ষের ফুড টেকনোলজি বিভাগে।

আদপে কী ঐ ন্যানো ছাঁকনি তা নিয়ে নবীন বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, বর্তমানে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে বাঁধতে সলভেন্ট ক্যাপচার ইউনিটে যে দ্রাবক ব্যবহার করা হয় তা অনেক ব্যয়বহুল। সেই সঙ্গে ঐ কাজ করার জন্য আরো রাসায়নিক ব্যবহার করতে হয়। ঐ পদ্ধতিতে বর্জ্য গ্যাসের মধ্যে থাকা সালফার-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড গ্যাসকে বের করে দিয়ে শুধুমাত্র কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে শোষণ করা হয়ে থাকে। গোটা এই পদ্ধতিতে রাসায়নিক দ্রাবকের প্রয়োজন হয়। বাজারে এর দামও অনেক। কেবলমাত্র দামের কথাই ভেবে অনেক কলকারখানা তা ব্যবহার করতে চায় না। ছাত্রদের দেখানো ন্যানো ছাঁকনিতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাঁধা পড়বে অতিরিক্ত কোনো রাসায়নিক ছাড়াই। ন্যানো প্রযুক্তিতে তৈরি ঐ ছাঁকনি আদপে উচ্চ তাপ সহনশীল প্লাস্টিকের অতিসূক্ষ্ম এক ঝিল্লি। পলিমার দিয়ে তৈরি ঐ ন্যানো মেমব্রেন। এটি তৈরি করতে লাগবে মাত্র তিনটি যৌগ। পলি ভিনাইল অ্যামাইন, পলি সালফোন সাবস্ট্রেট আর পলি প্রপিলিন। ব্যাস, এইটুকুই। শেষের দুই উপাদান আদপে ন্যানো পার্টিকেল। এইজন্য গ্যাস ছাঁকনির নাম দেওয়া হয়েছে ন্যানো মেমব্রেন। কী করবে এই মেমব্রেন? এটি প্রথমে সব বর্জ্য গ্যাসকে একসাথে টেনে নেবে। এরপর ঐ গ্যাস যখন ফিল্টারের মধ্যে দিয়ে যাবে তখন মূলত কার্বন-ডাই-অক্সাইড কম সময়ে বাই-কার্বনেট আয়নে পরিণত হয়ে ছাঁকনিতে আটকে যাবে। আঠার মতো চটচটে হয়ে লেগে থাকবে ঐ গ্যাসের যৌগ।

নবীন গবেষকদের দাবি - এই পদ্ধতি বর্তমান চালু যেকোন পদ্ধতি থেকে বেশি কার্যকরী আর আর্থিক সাশ্রয়কারী। এখানে কোনো বাড়তি রাসায়নিক দ্রব্য না লাগায় তা নিয়ে বাড়তি কোনো ঝামেলা নেই। বাতাসে কার্বন কণা নির্গমনও কয়েক গুণ কমে যাবে। এই পদ্ধতির নাম ফিক্সড সাইট ক্যারিয়ার (এফ এস সি)। চলতি পদ্ধতিতে যে দ্রাবকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড শুষে নেওয়া হয়, সেখান থেকে ফের কার্বন-ডাই-অক্সাইড আলাদা করার জন্য বাড়তি খরচ করতে হয়। এর কারণ কার্বন-ডাই-অক্সাইডের একটা বাণিজ্যিক চাহিদা রয়েছে। রেফ্রিজারেশন ইন্ডাস্ট্রিতে 'ড্রাই আইস' হিসেবে কিংবা ব্রেভারেজ, সফট ড্রিঙ্কস ইন্ডাস্ট্রিতে তা ব্যবহার করা হয়।

ন্যানো মেনব্রেন ব্যবহার করলে বাণিজ্যিক কাজে কার্বন-ডাই-অক্সাইড পেতেও সুবিধা হবে বলে জানাচ্ছেন ঐ তিন ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র। পরিবেশ দূষক ঐ গ্যাসকে পুরোদস্তুর বাণিজ্যিক কাজে লাগানোর সঙ্গে পরিবেশকে বাঁচানোও যাবে। গবেষক ছাত্ররা জানাচ্ছেন, এই রকমের একটা প্রচেষ্টা নরওয়েতে চলছিলো। হলদিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অনুষ্ঠিত ন্যানো প্রযুক্তির আন্তর্জাতিক সম্মেলনে নবীন বিজ্ঞানীদের এই খোঁজ দারুণ সাড়া ফেলেছিলো। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ঐ প্রযুক্তি সম্মেলনটি

আয়োজন করেছিলো। দেশ বিদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আগত ছাত্র-অধ্যাপকরা সেইসময়ে তৃতীয় বর্ষের ছাত্রদের চিন্তার অভিনবত্বকে প্রশংসা করেছে। দূষক গ্যাস কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে বাঁধতে আমাদের রাজ্যের ছাত্রদের এই খোঁজ আদপে কাজে আসলেই খুশি নবীন বিজ্ঞানীরা। তাঁদের গবেষণাকে তাই বিশ্বের অন্যত্র ছড়িয়ে দিতে উদ্যোগী হয়েছে ঐ তিন ছাত্র।

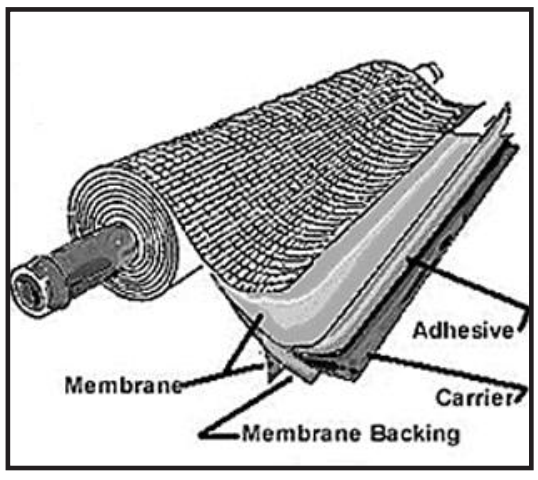

চেষ্টায় বাড়ে একাগ্রতা

৪ পাতার পর

পরীক্ষার সময় –

পরীক্ষার সময়ে অনেকেরই চিন্তা, উদ্বেগে একাগ্রতা কমে। পরীক্ষা মানে কিন্তু তোমার দক্ষতার মূলায়ন, গোটা 'তুমি'র নয়।

এক ডজন টিপস্ –

১। তুমি যা জানো তাতো জানোই। মনে রাখবে বেশিরভাগ চিন্তাই কিন্তু খারাপ ফলকেন্দ্রিক। এই সমস্যা তাড়াতে বাড়িতে ঘড়ি ধরে নিজেই নিজের পরীক্ষা নাও। নিজের মান ও দক্ষতাও যেমন বুঝতে পারবে তেমনই কমবে উদ্বেগ।

২। সময়মতো খাওয়া ও ঘুম জরুরি। হাঁটা, সাঁতার, দাবা, যোগাসন মনোসংযোগ বাড়ায়।

৩। সময় কম অথচ প্রচুর পড়া। যেগুলি পড়া হয়নি সেগুলি আগে পড়ো।

৪। পড়তে বসার আগে অন্য সব গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেরে নাও। পড়ার সময় হতে হবে 'আনডিসটার্বড'।

৫। 'পড়ার হয় পড়ছি, বাকিটা ভাগ্য' – এই ধরণের কথা না ভেবে 'আমি সফল হবোই' ভাবো।

৬। মন না বসলে জীবনের সেরা ও মজার মুহূর্তগুলো ভাবো।

৭। পরীক্ষার সময় যে প্রশ্নের উত্তর জানা আছে সেগুলো আগে লেখো।

৮। রাত জেগে পড়লে দু'তিনজন বন্ধু সঙ্গে পড়াশুনা করো। একা জাগা কষ্টকর। এটা অবশ্যই একটু বড়োদের জন্য বললাম।

৯। চা-কফি চলতে পারে। তবে এর কার্যকারীতা নিয়ে প্রশ্ন আছে।

১০। নিজের পড়াশুনার 'পিক' টাইমটা খুঁজে বার করতে হবে। দেখা গেছে একদম ভোরের দিকে বা রাতে পড়া ভালো হয়।

১১। শুধুমাত্র পড়ার জন্যই রাতকে ব্যবহার করতে হবে। লেখা, রুটিন তৈরি বা পরিকল্পনা অন্য সময়ে।

১২। আজকের রাতের পড়া পরের দিন দেখতেই হবে। সম্ভব হলে ২-৫ দিন পরে আবার।

সবশেষে

মগ্নতা মানুষকে আনমনা করে। নিউটন, জীবনানন্দ, সুকান্ত, রবীন্দ্রনাথ প্রতিটি সৃষ্টির পরেই আনমনা থাকতেন, আসলে মগ্ন থাকতেন পরবর্তীতে। প্রখর অনুভূতিপ্রবণরা একটু আনমনাই হয়। আর তাঁরাই পারেন কিছু ছাপ রেখে যেতে। তাই বলি, মনোযোগী না হওয়াটা কোনো অন্যায় নয়, বরং তুমিও পারবে কিছু করতে। হ্যাঁ পারবেই।

ডা. কেদাররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ ৯৮৩০০ ২৭৯৭৬

লক্ষ্মীনারান

৫ পাতার পর

এত গালাগালিতে লক্ষ্মীনারানের বড়ই ক্রোধের উদয় হইয়াছে। সে এক-একবার হাতি চড়িবার বিষয় স্মরণ করিতেছে অমনি রাজপুত্রের ভাবটা মনে আসিয়া পড়িতেছে। শেষে সে আর গালাগালি সহ্য করিতে না পারিয়া গম্ভীরভাবে গৃহের বাহির হইয়া পিতাকে বলিল, 'যাঁ কঁরেছি তাঁ তোঁমরা জন্মেও কঁরো নি।'

পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী করেছিস কী?'

উত্তরে লক্ষ্মী বলিল, 'তোঁমার চোঁদ্দ গঁণ্ডা পুরুষেও তাঁ কঁরে নি।'

পিতা তবু বলিলেন, 'ওরে হতভাগা! কী করেছিস বল না?'

লক্ষ্মী বলিল, 'যাঁও যাঁও মুখ খাঁরাপ কঁরো না বঁলছি। রাজপুত্রে যাঁ কঁরে তাঁই কঁরেছি।'

পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী রাজপুত্রের কাজটা করলি?'

উত্তরে লক্ষ্মীনারান বলিল, 'আঁমি হাঁতি চঁড়েছি।' এই বলিয়া রাজপুত্রের মত গরবে-গরবে পা ফেলিয়া ঘরের ভিতর গেল।

শুরু হয়েছে ক্যুইজ। অসংখ্য পাঠক-পাঠিকা এবং কচিকাঁচাদের অনুরোধে আমাদের এই বিভাগ **মগজাস্ত্র**। তোমাদের জন্য কলম ধরেছেন **ড. মৌসম মজুমদার।**

জিওফ হার্স্ট

১। বিশ্বকাপ ফুটবলের ইতিহাসে কোন ম্যাচে সবচেয়ে বেশি দর্শক উপস্থিত হয়েছিল?

২। বিশ্বকাপ ফুটবল ফাইনালে এখনো পর্যন্ত একজন খেলোয়াড়ই হ্যাটট্রিক করার দুর্লভ নজির গড়েছেন। কে তিনি?

৩। বিশ্বকাপ ফুটবলের ইতিহাসে কোন খেলোয়াড় সবচেয়ে বেশি বিশ্বকাপ ম্যাচ খেলেছেন?

৪। কোন খেলোয়াড় নিজের দেশের হয়ে বিশ্বকাপ ফুটবলও খেলেছেন আবার ক্রিকেটেও খেলেছেন?

৫। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, ভারত একবার বিশ্বকাপ ফুটবলে খেলার সুযোগ পেয়েছিল। এখন প্রশ্ন, কোন বছর ভারত বিশ্বকাপ ফুটবলে খেলার সুযোগ পেয়েছিল এবং অধিনায়কই বা কে ছিলেন? ভারত কী ফল করেছিল?

৬। এবছর বিশ্বকাপ ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর আগে কবে বিশ্বকাপের আসর ব্রাজিলে বসেছিল?

৭। ব্র্যাজুক্যাম কি?

৮। বিশ্বকাপের ইতিহাসে কোন দেশ সবচেয়ে বেশিবার সেমিফাইনাল ও ফাইনাল খেলেছে?

৯। প্রথম বিশ্বকাপের আসর বসেছিল ১৯৩০ সালে উরুগুয়েতে। ১৩টি দেশ এতে অংশ নেয়। কোন কোন দেশ?

১০। প্রতি চার বছর অন্তর বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হলেও ১৯৪২, ১৯৪৬ সালে বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়নি। কেন?

১১। ১৯৬৬ সালে প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবলে 'ম্যাসকট' প্রকাশ করা হয়।। প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবলের ম্যাসকটের নাম কী ছিল?

১২। ট্যাঙ্গো, এমপানা, কুয়েস্ত্রা, ফেভারনোভা, ট্রাইকালার, জাবুলানি, টেলস্টার - যদি বিশ্বকাপ ফুটবলের কথা ধরা হয়, এই নামগুলির মধ্যে মিল কোথায়?

১৩। এশিয়ার কোন দল সর্বপ্রথম বিশ্বকাপ ফুটবলের সেমিফাইনালে খেলেছিল?

১৪। এবারের বিশ্বকাপ ফুটবলে প্রতিযোগিতার ম্যাসকট ফুলেকো। এটা কোন প্রাণির অনুকরণে সৃষ্টি করা হয়েছে?

১৫। ১৯৩০ সালে প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে কোন দুটি দল অংশ নিয়েছিল? ফলাফলই বা কি হয়েছিল?

এবারের বিশ্বকাপের ম্যাসকট 'ফুলেকো'

মিলিয়ে নাও

১। ব্রাজিলের মারকানা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ব্রাজিল ও উরুগুয়ে ম্যাচে (১৯৫০ সাল) মোট উপস্থিত দর্শকের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৯৯ হাজার ৮৫৪ জন ২। ১৯৬৬ সালে জার্মানির বিপক্ষে ইংল্যান্ডের জিওফ হার্স্ট, এই দুর্লভ নজির গড়েন ৩। জার্মানির লোথার ম্যাথাউস (২৫টি ম্যাচ) (১৯৮২, ১৯৮৬, ১৯৯০, ১৯৯৪, ১৯৪৮) ৪। ভিভ রিচার্ডস (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) ৫। ১৯৫০ সালে, অধিনায়ক ছিলেন শৈলেন মান্না। কিন্তু ভারত ঐ বিশ্বকাপে অংশই নিতে পারেনি কারণ বিশ্বকাপে খালি পায়ে অংশ নেওয়া যেত না, কিন্তু ভারতীয় খেলোয়াড়দের বুট ছিল না। যদিও আরো অন্যান্য কারণ ছিল, কিন্তু সেগুলি প্রকাশ পায়নি ৬। ১৯৫০ সালে ৭। এবার বিশ্বকাপে ব্যবহৃত বিশেষ অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ক্যামেরা যেটি ব্রাজুকা ফুটবলের মধ্যেই লাগানো থাকবে ৮। জার্মানি ১১ বার সেমিফাইনাল এবং ব্রাজিল ও জার্মানি দুটি দেশই ৭ বার ফাইনালে খেলেছে ৯। উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, চিলি, মেক্সিকো, পেরু, প্যারাগুয়ে, বেলজিয়াম, বলিভিয়া, রোমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ১০। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য ১১। উইলি ১২। এগুলি বিভিন্ন বিশ্বকাপে ব্যবহৃত অফিসিয়াল বল ১৩। দক্ষিণ কোরিয়া (২০১০) ১৪। আর্মাডিলো ১৫। উরুগুয়ে ও আর্জেন্টিনা। উরুগুয়ে ৪-২ গোলে আর্জেন্টিনাকে পরাজিত করেছিল।

আতঙ্ক নয়, অঙ্ক

রামানুজন ও ট্যাক্সিক্যাব সংখ্যা

রামানুজনের ট্যাক্সিক্যাব সংখ্যা বলার আগে তোমাদের রামানুজনের সম্পর্কে কয়েকটি এবং ট্যাক্সিক্যাব সংখ্যা আবিষ্কারের সঙ্গে জড়িত গল্পটির কথা বলে নেওয়া যাক।

প্রখ্যাত গণিতবিদ রামানুজন মাত্র ৩২ বছর বেঁচে ছিলেন। ১৮৮৭ সালের ২২ ডিসেম্বর তৎকালীন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির (বর্তমানে তামিলনাড়ু) ইরোডে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২০ সালের ২৬ এপ্রিল এই গণিতজ্ঞ প্রয়াত হন। কোনোদিন পিওর ম্যাথমেটিক্স-এর সরাসরি ছাত্র না হয়েও সংখ্যা, অসীম সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে অসংখ্য গাণিতিক সমাধান সুত্র তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। সেজন্য তাঁকে 'দ্যা ম্যান হু ডিসকভার ইনফিনিটি' ও বলা হয়। শুধু তাই নয়, এই মহান গণিতবিদকে সম্মান জানিয়ে ২০১১ সালে ভারত সরকার রামানুজনের জন্মদিনটিকে 'ন্যাশনাল ম্যাথমেটিক্স ডে' হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

রামানুজনের গণিত বিষয়ক মেন্টর ছিলেন জি এইচ হার্ডি। একবার লন্ডনে অসুস্থ হয়ে পড়ায় রামানুজনকে দেখতে হাসপাতালে যান হার্ডি। এই দেখতে যাওয়ার সময় একটা মজার ঘটনা ঘটে। আমরা পুরো ঘটনাটি হার্ডির ভাষাতেই শুনি- I remenber once going to see him when he was ill in Putney. I had ridden in taxi-cab number 1729 and remarked that the number seemed to me rather a dull one, ..."No" he replied, "it is a very interesting number; it is the smallest number expressible as the sum of two cubes in two different way." বাংলায় ভাবানুবাদ করলে হার্ডির কথাটি দাঁড়ায়- ''একবার আমি পুটনিতে হাসপাতালে অসুস্থ রামানুজনকে দেখতে যাচ্ছিলাম । যাওয়ার পথে একটি ট্যাক্সি ধরি, যেটির নম্বর ছিল ১৭২৯। হাসপাতালে গিয়ে ট্যাক্সির নম্বরের কথা বলে আমি নম্বরটিকে অকেজো হিসেবে অভিহিত করি। কিন্তু রামানুজন বলেন,'না, এটা একটি মজার সংখ্যা। ১৭২৯ সংখ্যাটি এমন সংখ্যার সারির ক্ষুদ্রতম, যেটিকে দু'টি সংখ্যার ঘন'র যোগফল হিসাবে দু'ভাবে উপস্থাপন করা যায়।' শুনে আমি অবাক।''

এসো, এবার দেখে নেওয়া যাক, রামানুজন হাসপাতালে শুয়ে ঠিক কী বলতে চেয়েছিলেন।

যেহেতু ট্যাক্সির নম্বর থেকে এই ধরনের সংখ্যার আবিষ্কার তাই একে 'ট্যাক্সিক্যাব' নম্বর বলা হয়। আবার রামানুজন এই বিষয়টিকে প্রথম চিহ্নিত করেছিলেন বলে এই ১৭২৯ সংখ্যাটিকে রামানুজন সংখ্যাও বলা হয়। এই সংখ্যাটির আরো কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। ১৭২৯ সংখ্যাটির সংখ্যাগুলির যোগ (১+৭+২+৯) করলে হয় ১৯। এবং ১৯-এর একক ও দশকের সংখ্যা পরস্পর স্থান পরিবর্তন করলে হয় ৯১। আবার ১৯ এবং ৯১গুণ করলে (১৯x৯১) হয় ১৭২৯। ট্যাক্সিক্যাব নিয়ে আরো কিছু কথা ও উদাহরণ তোমাদের জন্য আগামী সংখ্যায় থাকছে।

ছন্দে আনন্দে

বেড়াল রহস্য

স্বপ্না ভট্টাচার্য

পিসিদের বাগানেতে জন্মালো পুষি এক
লেজহীন পুষি দেখে বুবান তো হতবাক!
ঠাম, দাদা, পিসিদিদা কত কিছু বল্‌লো
সারাদিন সেই নিয়ে গবেষণা চল্‌লো।
ঠাম বলে -
ওর যে যমজ ছিলো
বেড়ালের জঠরে
নির্ঘাত সেই ব্যাটা
দিয়েছিল কামড়ে।
এর জোর কত দেখ্‌
দিয়েছে এমন লাথ্‌
অক্কা পেয়েছে ব্যাটা
ঐখানে নির্ঘাত।
পিসিদিদা বলে ওঠে -
একদম বাজে কথা,
কে যে কী বা ব'লে দেয়
নেই তো মুণ্ডুমাথা।
এইবেলা শুনে রাখ্‌
লেজ ছিল ওর ঠিক
সরু আর বিচ্ছিরি
একদম লিকপিক্‌।
তাই দেখে পুষি-মা
কেটে দিল লেজখান
বিচ্ছিরি লেজ হ'লে
হ্যাটা দেবে খানদান!
বুবান ভাবতে বসে সত্যি কী তাহলে!
নিশ্চয়ই জানা যাবে আরো মাথা ঘামালে।
লেজ তার ছিলো, না কি
লেজহীন পুষি সে
মানুষ তাহলে হবে
এই ভেবে খুশি সে।
মানুষেরও লেজ ছিল
আজ তার লেজ নাই
এ বেড়ালও সেই দলে
বুবানও যে ভাবে তাই।
পুষি-মাকে দেখলে সে
খুশি মনে চাটছে
বুবান নিজের মনে
বইখাতা ঘাটছে।
কী দিয়ে সে শুরু করে
পড়বে'বা কী ভাষায়
দাদানের কাছে গেল
পথ পাবে সে আশায়।

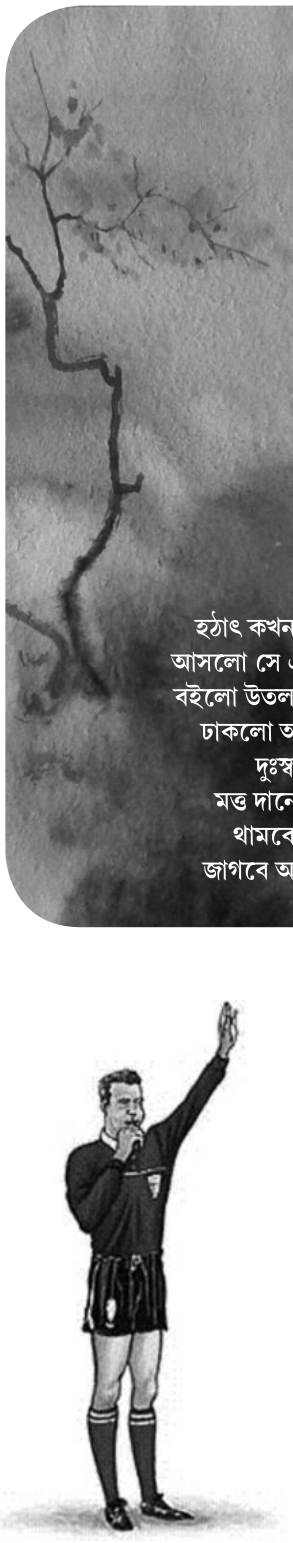

কালবোশেখী

দীপ মুখোপাধ্যায়

হঠাৎ কখন নামল আঁধার, হারিয়ে দিয়ে দিনের আলো
আসলো সে এক কালবোশেখী উড়িয়ে নিয়ে পথের ধুলো।
বইলো উতল মাতাল হাওয়া, গাছগুলো সব ভাঙলো ঝড়ে
ঢাকলো আকাশ বর্ষা মেঘে, নিভল প্রদীপ অন্ধকারে।
দুঃস্বপ্নে ছিল প্রহর দীর্ঘশ্বাসের দুঃখে ভরা
মত্ত দানোর ঝঞ্ঝা খেলেই কাঁপলো মাটি বসুন্ধরা।
থামবে শেষে মরণদোলা হাহাকারে পূর্ণ রবে,
জাগবে আবার চাঁদ তারা ফুল এই পৃথিবী শান্ত হবে।

কিচির মিচির

সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি প্রয়াস তোমাদের তরে
ছোট্ট পাখির গান
কিচির মিচির কালকাকলীতে
উঠবে ভরে প্রাণ
ছোট্ট সোনা বন্ধুরা সব
তোমাদেরই দ্বারে
দাঁড়ায়ে আছে কিচির মিচির
বরণ কর তারে।
যদি তোমাদের লাগে ভালো
দু' হাত বাড়ায়ে ডেকো
কিচির মিচির-এর সাথী হয়ে
মোদের সাথে থেকো।
তোমাদের হাসি আনন্দ আর
তোমাদের কলতান
এটাই জেনো তোমাদের সাথী
কিচির মিচির-এর প্রাণ।

রেফারির কেরামতি

দেবব্রত দাশ

বিশ্বকাপের দুটো দলে
হচ্ছে দারুন খেলা,
দেখতে হলে এসো ছুটে
এক্ষুনি এই বেলা।
বল ধরে যখুনি কেউ,
অমনি ঠ্যাঙে ঠ্যাঙ
বাধিয়ে দিয়ে আর কে জনায়
ঝাড়ছে জবর ল্যাঙ।
রক্ষে তবু ..., রেফ্‌রি-ভায়া
ভীষণ রকম কড়া,
লেটেস্ট যত নিয়ম-কানুন
তাঁর তো সবই পড়া।
হলুদ ছেড়ে লালকার্ড তাই
বাড়িয়ে ধরেন তিনি
জীবন নিয়ে কক্ষনো নয়
এমন ছিনিমিনি।
শেষ বাঁশিটা বাজতে যখন
বাকি মিনিট চার,
তখন কেবল রইল টিঁকে
দু'জন গোল-কিপার।

অণুছড়ার ছড়াছড়ি

এখন গোটা বিশ্ব গোল-গপ্পে মেতে রয়েছে। ছড়াই-বা বাদ যাবে কেন!

ঝড় উঠেছে চায়ের কাপে
সাপোর্টাররা দিচ্ছে লাফ,
পারফরমেন্সটা কাদের ভালো
জিতবে কারা বিশ্বকাপ?

গোল ছাড়া যে খেল জমে না
ঠিকই জানে নেইমারে
সারা বিশ্ব উঠল কেঁপে
পায়ের আঘাত যেই মারে।

নব্বই মিনিটে হল না গোল
চারিদিকেতে ছি ছি!
শেষ মারটা ঠিকই দিল
ফুটবল নায়ক মেসি।

'ওস্তাদের মার শেষ রাতে'
ঠিক বোঝালো মেসি,
ফুটবলেরই জাদুকর সে
হয়নি বলা বেশি।

খেলা চলে ব্রাজিলে
ফেসবুকে যুদ্ধ
কার দল হবে সেরা
কার বাণী শুদ্ধ?

তীরে এসে ডুবলো তরী
কপাল পোড়া ইরান
বীরের মতো খেললি তোরা
রাখলি দেশের নাম আর মান।

- সোহানুর রহমান

আমরা যখন দেখছি খেলা
ব্রাজিল করে খেয়াল
মেক্সিকোদের গোলকি যেন
আস্ত চীনের দেয়াল।

জায়েন্ট বধের যজ্ঞে এবার
বধ হয়েছে ইতালি,
কোস্টারিকার সাহস দেখে
আমরা এখন দি' তালি।

ভাষ্যকারে মাঝে মাঝে
যদিও সদাই শোর করছে
বিশ্বকাপে অনেক ম্যাচই
থেকে থেকেই 'বোর' করছে।

- জগলুল হায়দার

আবার দেখা গেল মেসির জাদু
তার গোলে যে খুশি নাতির দাদু
খুশি পাড়ার বুড়ো-বুড়ি যত
মেসির জাদু দেখবে অবিরত।
মেসিই হল সবার সেরা বস
মেসিতে আজ হলো ইরান ধস।

- সোহেল রানা বীর

ধারাবাহিক উপন্যাস

বুমবুম আর উড়ে গেল রাজার মুকুট

বিবেক কুণ্ডু

(আগে যা ঘটেছে - বুড়ো আর জুড়ো নামের দুই কালো চিতাবাঘকে গুহার বাইরে পাহারায় রেখে মিটিং করতে ঢোকে দুষ্টু শকুন খটাখট। বৈজ্ঞানিক পানিনির তৈরি এক অভিনব যন্ত্র কানে লাগিয়ে গুহার ভেতরের সব কথা শুনে ফেলে জুড়ো আর বুড়ো। তারা জেনে যায় গুহার ভেতরে রয়েছে এক অজানা মহারাজ যে কিনা ঈগল রাজার মুকুট হাতিয়ে সবুজ পাহাড়ের রাজা হতে চায়। এদিকে সবুজ পাহাড়ের গুপ্তচর বুদ্ধিমান বাদুড় ফুড়ুৎ জুড়ো বুড়োর কথা শুনে জানিয়ে দেয় গিরগিটিকে, যে ছোটে বুড়ো মৌমাছির কাছে, খবরটাকে সংকেত বানিয়ে সবুজ পাহাড়ের পাঠাতে। বুমবুম নতুন সাইকেল শিখতে গিয়ে মুশকিলে পড়ে। বুমবুমের সঙ্গে থাকে ওর সব সময়ের সাথি অ্যালসেশিয়ান ডিংগো, যে দৌড়ে দৌড়ে বুমবুমকে সাইকেল শিখতে সাহস যোগায়। অদৃশ্য কেউ পিছন থেকে ধরে থেকে বুমবুমকে সাইকেল শিখিয়ে দেয়। কিন্তু সাইকেল শেখার আনন্দে বুমবুম ভুল দিকে সাইকেল চালিয়ে ফেলে আর দেখে তার সাইকেলের দিকে এগিয়ে আসছে ঘোষদের বাড়ির হোঁৎকা ছেলেটা।)

ছেলেটাও ততক্ষণে বুঝতে পেরে গেছে ব্যাপারটা। কিন্তু সে চেঁচিয়ে উঠে সরে যাবার আগেই বুমবুমের সাইকেলের চাকা ঢুকে পড়ল তার দুই পায়ের ফাঁকে আর ছেলেটা যেন বসে পড়ল সাইকেলের চাকার ওপর।

ছেলে সমেত সাইকেল ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলল একটা ভাঙ্গা পাঁচিলের দিকে।

ছেলেটা তখন জোরে জোরে চেঁচাচ্ছে, "বুমবুম তুই সাইকেলটা থামা। ব্রেক চাপ প্লিজ, আমি আর তোকে নিয়ে মজা করব না।"

আরে তাইতো! ব্রেক-এর কথাটা ভুলেই গেছে বুমবুম! মনে পড়তেই জোরসে ব্রেক চাপল আর তাতে পরপর তিনটে কাণ্ড হল।

এক - ঘোষেদের হোঁৎকা ছেলে ছিটকে পড়ল কাদার মধ্যে। কাদায় মাখামাখি হয়ে গেল ঠিক ভূতের মতন।

দুই - তাল সামলাতে না পেরে সাইকেল সমতে বুমবুম ধপাস করে পড়ল রাস্তায়। হাতে পায়ে একটু ছড়ে গেল ওর।

আর তিন - বুমবুম শুনতে পেল পেছন থেকে কেউ খিক খিক করে হাসছে আর বলছে -

'বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে, ঘোষের ব্যাটা কিস্তিমাত,
করলে খারাপ, হবেও খারাপ, এ দুনিয়ার আসল বাত্।"

গলাটা বুমবুমের চেনা। এটা সেই লোকটার গলা যে ওর সাইকেলটা পেছন থেকে ধরেছিল আর তারপর ভ্যানিশ হয়ে গিয়েছিল ম্যাজিকের মতন।

পেছন ফিরে তাকাতে কাউকেই দেখতে পেল না বুমবুম। তার মানে আবার ভ্যানিশ।

ঘোষেদের ছেলেটা কোনোরকমে কাদামাখা অবস্থায় উঠে দাঁড়াল। ওকে দেখে ভীষণ লজ্জা করতে লাগল বুমবুমের। ইস্, কী করে যে সব গোলমাল হয়ে গেল। ও তো ইচ্ছে করে করেনি। এখন ওকে কী বলবে বুমবুম?

কিন্তু কিছুই বলতে হল না বুমবুমকে। ও উঠে দাঁড়িয়ে ছেলেটার দিকে এগোতেই ছেলেটা ভয় ভয় মুখ করে পিছতে শুরু করল। তারপর জোরসে ছুট লাগাল বাড়ির দিকে।

বুমবুমের খুব খারাপ লাগল। ছেলেটো নিশ্চয়ই ওকে খুব বাজে ভাবল।

পেছনে ঘুরে বুমবুম দেখল ওর সাইকেলটা পড়ে আছে আর তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ডিংগো। এগিয়ে এসে সাইকেলটা আস্তে করে তুলতে যাবে এমন সময় কে যেমন বলে উঠল, "বেশি লাগেনি তো বুমবুম?"

বুমবুম চিনতে পারল, সেই লোকটার গলা। ও কোনো উত্তর দিল না। সাইকেলটা তুলে দেখল হ্যান্ডেলটা একটু ঘুরে গেছে। পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখল হাঁটুর কাছে কেটে গেছে বেশ খানিকটা।

"এহে, কেটে গেছে দেখি! তুলো দিয়ে একটু স্যাভলন লাগিয়ে নিয়ো বাড়ি গিয়ে। পারবে তো? কথা বলছ না যে!" সেই গলাটা আবার বলে উঠল।

সাইকেলটা নিয়ে এগোতে এগোতে রেগে রেগে বলল বুমবুম, "যারা লুকিয়ে লুকিয়ে কথা বলে, আমি তাদের সঙ্গে কথা বলি না।"

তারপর ডিংগোকে বলল, "এই দ্যাখ, এই লোকটার কথা বলছিলাম। আমার সাইকেলের পেছনে ছিল তখন।"

"লোক? কাউকেই তো দেখতে পাচ্ছি না।" - অবাক হয়ে বলল ডিংগো।

"আরে রাগ করছ কেন? আমি কি খারাপ লোক? তখন তোমার সাইকেলটা কেমন পেছন থেকে ধরলাম?" লোকটা আবার বলে উঠল।

"ভালো লোকেরা লুকিয়ে লুকিয়ে কথা বলে না। ভালো লোকেদের সাহস থাকে। তারা সামনাসামনি কথা বলে।" বুমবুম চটপট জবাব দিল।

"আমাকে যে দেখা যায় না বুমবুম। আমি বাতাসে ভেসে বেড়াই।"

তাহলে তখন যে এলে। আমার সাইকেলটা ধরলে।"

সে তো তুমি চাইলে বলে।"

"আমি চাইলাম।"

"হ্যাঁ, তুমি সাইকেল চালাতে চালাতে মনে মনে ভাবছিলে না, কেউ এসে সাইকেলটা ধরুক, তাহলে পড়ে যাবার ভয়টা থাকবে না ... ভাবোনি? সত্যি করে বল তো।"

"ভাবছিলাম তো।"

"তাই তো আমি এলাম। আর তোমার সাইকেলটা ধরতেই তুমি চটপট সাইকেল চালাতে শিখে গেলে।"

"তাহলে এখন কেন এলে না? আমি পড়ে গেলাম। ওই ছেলেটারও কত জোরে লাগল।"

"তুমি চাইলে না যে। চাইলে তোমার আছাড় খাবার আগেই আমি সাইকেলটা ধরে ফেলতাম। তোমারও ব্যাথা লাগত না।"

"আর ওই ছেলেটা? ওকেও ধরে ফেলতে?"

"না, ওকে ধরতাম না। ওর আছাড় খাবার দরকার ছিল। ও তোমাকে রোজ রোজ খ্যাপাতো। তুমি খুব ভালো, তাই কিছু বলতে না। শাস্তি পাবার পর থেকে ও সবার সঙ্গে ভালো করে কথা বলবে।"

"আমি বাবার কাছে শিখেছি হাসি দিয়ে সবকিছুকে জয় করা যায়। তাই ওকে কিছু বলিনি। আচ্ছা, তুমি বুঝি আমি যা চাই সেটা জানতে পেরে যাও?"

"পারি তো। আমি যে ইচ্ছেভূত।"

"তুমি ভূত? ও বুঝেছি, সেই জন্যই তোমাকে দেখা যায় না। আচ্ছা তুমি কেমন ভূত? ঘাড় মটকানো কালো কুচকুচে দুষ্টু না গুপি বাঘার ভূতের রাজার মতো মিষ্টি?"

"হা হা হা। দারুণ বললে তো কথাটা। না না আমি ঘাড়টাড় মটকাই না। আমি মনের মধ্যে ঢুকে যাই আর মনের ইচ্ছেটাকে পড়ে ফেলি। যাকে আমার ভালো লাগে তার ইচ্ছেপূরণ করে দিই। তবে, দুষ্টু লোকের সঙ্গে খুব দুষ্টুমি করি আমি।"

"তাই বুঝি। আচ্ছা বলো তো, আমার এখন কী করতে ইচ্ছে করছে?" জানতে চাইল বুমবুম।

একমুহূর্ত পরে ইচ্ছেভূত বলল, "বাড়ি ফিরে কতক্ষণে আজকের ওয়ার্ল্ড কাপ ম্যাচটা দেখবে, এটাই ভাবছো তো?"

বুমবুম তো অবাক! একদম ঠিক বলেছে ইচ্ছেভূত। মেসির খেলাটা আজ কিছুতেই মিস করা যাবে না।

একটু হেসে বুমবুম বলল, "তুমি তো সত্যি সত্যি মনের ইচ্ছে বুঝতে পেরে যাও দেখছি। তুমিও কি ফুটবল খেলা দেখতে ভালোবাসো।?"

"খুউউউউউব। তবে তোমার মতো আমি মেসির ফ্যান নই।"

"তাহলে? তাকে ভালো লাগে তোমার?"

"পেলের নাম শুনেছো?"

"হ্যাঁ, বাবার ট্যাব এ দেখেছি সাদাকালো ছবিতে, দারুণ খেলতেন।"

"আমার ভালো লাগত পেলের খেলা। তারপর মারাদোনা, রুড গুলিট, ফ্র্যান্সিসকলি, ম্যাথুজ, প্লাতিনি, লিনেকার। আর গোল বাঁচানো ভালো লাগত পিটার শিলটনের। আরো পরে রোনাল্ডো, জিদানেরাও দারুণ খেলেছে। আজকাল মেসি ছেলেটা ভালো খেলে বটে তবে আমার আগেকার খেলা বেশি ভালো লাগত। আমাদের চাইনিজ ওয়াল গোষ্ঠবাবুর আমি বিরাট ফ্যান। আমি তো আর আজকের লোক নই।" এতটা বলে থামল ইচ্ছেভূত।

বুমবুম অবাক হয়ে বলল, "ওরেব্বাস! তুমি তো অনেক নাম জানো। আমি এদের মধ্যে মারাদোনাকে চিনি। সেদিনকেই ট্যাবে একটা ভিডিও দেখলাম। আর গোষ্ঠবাবু মানে কি গোষ্ঠ পাল?"

(আবার পরের সংখ্যায়)

শুরু হয়েছে খেলা নিয়ে আকর্ষণীয় এক কলম। একটু অন্যরকম। হবেই। শুধু মনে নয়, মননেও দাগ কাটবে। খেলা মানে, শুধু খেলাই নয়, খেলার আগে, পিছে বা সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মজাটাকে তুলে ধরাই এই কলমের মূল লক্ষ্য। - **কিচির মিচির**

অবাক খেলা

অলক চট্টোপাধ্যায়

খেলাধুলোয় লড়াই আছে, থাকবেও। কিন্তু হিংসুটেপনার কোনো সুযোগ নেই। কেউ কেউ 'কিচির মিচির'-র প্রথম সংখ্যায় এই ধারাবাহিক লেখায় শুধুই ফুটবলের উল্লেখ থাকার জন্য মৃদু অভিযোগ করেছেন। সবিনয়ে জানাই কোনো বিশেষ ভাবনায় ফুটবলকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। কিন্তু কথা যখন উঠেছে, তখন এবার থেকে শুধুই ফুটবল নয়, নানা ধরনের খেলার উল্লেখ এই পাতায় থাকবে। এবং ছোটো-বড়ো ঘটনাগুলোর একটা শিরোনামও দেওয়া হবে।

স্মরণীয় উপলব্ধি

দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রনায়ক নেলসন ম্যান্ডেলা ২০১০-এর বিশ্বকাপ (দক্ষিণ আফ্রিকাতেই আয়োজিত হয়েছিল)-এর সময় ফুটবল নিয়ে একটা চিরস্মরণীয় মন্তব্য করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে একদা বক্সার থাকা রাষ্ট্রনায়ক-এর মন্তব্য ছিল - 'If there is one thing on the planet that has the power to bind people, it is soccer'।

বিশ্বকাপ খুঁজে পেয়েছিল যে

খুঁজে না পেলে কী কাণ্ড হতো! ১৯৬৬-তে ইংল্যান্ডে বিশ্বকাপ ফুটবলের আসর বসেছে। কিন্তু সেখানে চুরি হয়ে গেল চ্যাম্পিয়নকে দেওয়ার জুলে রিমে ট্রফি (Jule Remet Trophy)। শেষ পর্যন্ত সব দুশ্চিন্তার অবসান করেছিল একটি কুকুর। জাতে 'মংগ্রেল' (Mongrel) এবং বয়স চার বছর। বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকা সেই কুকুরটির না 'পিক্‌লেস' (Pickles)। পরে ঘটনাটির প্রসঙ্গে পিক্‌লেস-এর মালিক যা বলেছিলেন তা জানার আগে ট্রফিটি ঠিক কোথায় পাওয়া গিয়েছিল সেটা জানা প্রয়োজন। সাউথ লন্ডন-এ নরউড-এ একটা মোটর গাড়ির পাশে সেটি পাওয়া গিয়েছিল। পিক্‌লেস-এর মালিক ডেভিড করবেট (David Corbeet) পরে বলেছেন, 'পিক্‌লেসই গাড়িটার কাছে পৌঁছে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। গাড়িটার সামনের চাকার পাশে প্যাকেটটা পড়েছিল। ইংল্যান্ডের নামী সংবাদপত্র 'দি অবজারভার'-এ প্রকাশিত সংবাদে করবেট বলেছিলেন - 'প্যাকেটটার খানিকটা কাগজ ছিঁড়ে ফেলা পরই আমি দেখতে পাই একজন মহিলা তাঁর মাথার ওপর একটা ডিস ধরে আছেন।' বলাই বাহুল্য, সেটাই ছিল জুলে রিমে ট্রফি। কয়েকদিন পরে ইংল্যান্ড দল ট্রফিটি জিতেছিল।

অন্যরকম নামকরণ

ব্রিটেন-এর বিখ্যাত দৌড়বীর সেবাস্টিয়ান কো (Sebastian Coe) তাঁর নামটা পেয়েছিলেন একটা বিশেষ ভাবনার জন্য। 'দি টেম্পেস্ট' -এর অবিস্মরণীয় চরিত্র ছিল সেবাস্টিয়ান। 'দি টেম্পেস্ট'-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কো-র মা ছেলের নামকরণ সেবাস্টিয়ান করেছিলেন। এবং সেখানেই গল্পের শেষ নয়, সেবাস্টিয়ান-এর বোন-এর নামও এসেছিল ওই 'দি টেম্পেস্ট' থেকে, তাঁর নাম দেওয়া হয়েছিল 'মিরান্দা'। সেই নামটাও দিয়েছিলেন তাঁদের দুজনেরই মা, যিনি পেশায় ছিলেন তৎকালীন সময়ের একজন খ্যাতনামা অভিনেত্রী।

উল্টে আম্পায়ারকেই ধমক

হ্যাঁ, ধমকটা দিয়েছিলেন ক্রিকেটের অবিস্মরণীয় চরিত্র ডব্লু জি গ্রেস (W G Grace)। একটা ম্যাচে গ্রেস-এর বিরুদ্ধে আউট-এর বিরুদ্ধে আউট-এর আবেদনে আম্পায়ার আঙুল তুলে তাঁকে আউট ঘোষণা করেন। আউটের সিদ্ধান্তে খুবই বিরক্ত হয়ে ডব্লু জি আম্পায়ারের কাছে গিয়ে তাঁকেই রীতিমত ধমক দিয়েছিলেন। তিনি যা বলেছিলেন তা এখনো ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে দাগ কেটে আছে। গ্রেস বলেছিলেন 'শোন, দর্শকরা তোমার আম্পায়ারিং দেখতে এখানে আসেনি, এসেছে আমার ব্যাটিং দেখতে বুঝলে?'

বড়ো দাবাড়ু হতে চাই অদম্য মানসিক শক্তি

চেস দাদু

শুরু হয়েছে ধারাবাহিক দাবা চর্চা। পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে দাবা চর্চায় মন দিলে পড়াশোনার উন্নতি হয়, জানাচ্ছেন গবেষকরা। তবে শুধু কাগজে-কলমে বা বোর্ডে দাবা চর্চাই নয়, ভালো দাবাড়ু হতে গেলে দরকার শারীরিক ও মানসিক শক্তি। **চেস্ দাদু** তোমাদের সামনে যেমন বিভিন্ন বিশ্বখ্যাত দাবাড়ুদের কথা তুলে ধরবেন তেমনি থাকবে রাজ্যের ও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত দাবা প্রতিযোগিতার ফলাফল।

তোমাদের আগেই বলেছি কলকাতা এবং তার আশেপাশে কয়েকটি চেস কোচিং সেন্টার আছে। সেদিন এমন একটি সেন্টার-এ উপস্থিত হয়েছিলাম। দমদম ক্যান্টনমেন্ট এলাকার মধ্যে নলতা রিক্রিয়েশন ক্লাব এই দাবা প্রশিক্ষণ শিবিরটি পরিচালনা করে। প্রায় ৪০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে এই কেন্দ্রটি চলছে। প্রধান প্রশিক্ষক দেবব্রত দাস এক সময়ে বেঙ্গল রানার্স ছিলেন। ভাল ব্যবস্থা। অভিভাবকরা নির্দিষ্ট জায়গায় বসেছেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে খেলা। কয়েকজন প্রশিক্ষক এদের দিকে নজর রাখছেন। খুব আনন্দের কথা 'অল বেঙ্গল এজ গ্রুপ চেস্ চ্যাম্পিয়নশিপ' প্রতিযোগিতায় এদেরই ছাত্রী সিন্থিয়া সরকার অনূর্ধ-৭-এ তৃতীয় স্থান লাভ করেছে। এখানে যারা শিখছে তাদের মধ্যে হয়তো কেউ আগামী দিনে বড়ো মাপের দাবাড়ু হয়ে উঠবে।

এবার তোমাদের ভারতে গর্ব কয়েকবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন বিশ্বনাথন আনন্দ সম্পর্কে কিছু বলি। ১৯৮৩ সালে গুজরাট ইউনিভার্সিটির জিমনাসিয়াম হলে নেশন 'বি' দাবার আসর বসেছিল। বেঙ্গল টিম-এ তোমাদের চেস্ দাদুও ছিল। সেখানে ১৪ বছরের একটি ফুটফুটে বাচ্চা তার মার সাথে এসেছে।

জানলাম এই বাচ্চাটি দাবায় বালক-প্রতিভা আনন্দ। আনন্দ নেশন 'বি' দাবাতে প্রথম খেলতে এসেছে। একদিন প্রতিযোগিতার বিশ্রাম-দিনে হলে ওর মার সাথে আনন্দ এল। অনেকের সঙ্গে খেলল। আমিও খেললাম। জিততে পারলাম না। কিন্তু ড্র করেছিলাম। ওর মায়ের কাছে ছেলেটির শুভকামনা করলাম। কিন্তু সে সময় কে জানত এই বালকটি একদিন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হবে। তাও একবার নয় কয়েকবার আনন্দ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। আনন্দকে ভারতরত্ন সম্মান দেওয়ার দাবি বারবার বিভিন্ন ভাবে উঠেছে। ছোটোরা যারা খেলছো তাদের বলি শরীরশিক্ষা নিয়মিত করবে। কারণ সুস্থ শরীর না হলে ভালো খেলা সম্ভব নয়। যেসব দাবাড়ু অনেক নাম করেছেন তাঁদের বড়ো হওয়ার পথে অনেক সাধনার প্রয়োজন হয়। এখানে একটি উদাহরণ হাজির করছি।

তোমরা সকলেই জানো নিল আর্মস্ট্রং চাঁদে প্রথম পা রেখেছিলেন। পৃথিবী থেকে তাঁর রওনা হওয়ার পর অনেকগুলি স্তর অতিক্রম করতে হয়েছে। প্রথম উৎক্ষেপণ ও পৃথিবীর কক্ষপথে অবস্থান করা। তারপর রকেট জ্বালিয়ে চাঁদের কক্ষপথে যাওয়া। তারপর আবার রকেট প্রজ্জ্বলিত করে চাঁদে নামা। এসব বললাম এজন্য, যে একজন দাবাড়ু তোমাদের ছোটোবেলায় খেলা শিখে একটা স্তর পর্যন্ত যায়। আর কেউ কেউ সেই স্তর আর অতিক্রম করতে পারে না। কেউ কেউ সেই স্তর থেকে আরো সাধনা ও কঠিন পরিশ্রম করে আরেকটি স্তরে যায়। একইভাবে কেউ কেউ এই স্তরে আটকে থাকে। কয়েকজন আবার আরো গভীর মনোযোগের সাথে নিষ্ঠা ও সাধনার দ্বারা এই স্তরকে অতিক্রম করে। আনন্দের মতো দাবাড়ুরা একবারে উচ্চপর্যায়ের স্তরে চলে গিয়েছেন। ঠিক এক একটা ধাপ অতিক্রম করা আর যেন নতুন করে রকেট প্রজ্জ্বলিত করে আরেকটি ধাপের দিকে এগিয়ে যাওয়া। অতএব বুঝতেই পারছো বড়ো দাবাড়ু হতে গেলে মনে কত ক্ষমতা আনতে হবে। আজকে বেশি কিছু জানালাম না। পরের সংখ্যায় অন্য কোনো দাবাড়ুর কথা বলব। মন দিয়ে লেখাপড়া, শরীরশিক্ষা ও দাবা খেলা তিনটি ক্ষেত্রেই গভীর মনোযোগ দিতে হবে। তোমাদের চেস্ দাদু সবসময় তোমাদের সাথে আছে।

দ্রুত পঞ্চম

বন্যা বিধ্বস্ত নাটালের দাস দুনাস আরেনার গ্যালারিতে দর্শকরা ঠিকঠাক বসার আগেই ঘানার জালে বল জড়িয়ে দিয়ে দ্রুততম গোল করার তালিকায় ধুকে পড়লেন আমেরিকার ক্লিন্ট ডেম্পসি। খেলার বয়স তখন মাত্র ২৯ সেকেন্ড। বিশ্বকাপের ইতিহাসে এটি পঞ্চম দ্রুততম গোল। খেলা শুরুর পর সবথেকে কম সময়ের মধ্যে গোল করার রেকর্ডটি রয়েছে তুরস্কের হাকান সুকুরের। ২০০২-এর বিশ্বকাপে দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে মাত্র ১১ সেকেন্ডের মাথায় গোল করেছিলেন সুকুর। দ্রুততম গোলের ভিত্তিতে সুকুরের পরেই রয়েছেন চেকোশ্লোভাকিয়ার ভাস্লাভ মাসেক (১৬ সেকেন্ড), জার্মানির এর্নস্ট লেনের (২৫ সেকেন্ড), ইংল্যান্ডের ব্রায়ান রবসন (২৭ সেকেন্ড)।

জোড়া জয়

জার্মানির বেকেনবাওয়ার এবং ব্রাজিলের মারিও জাগালো খেলোয়াড় ও প্রশিক্ষক হিসেবে বিশ্বকাপ জয়ের নজির তৈরি করেছেন।

স্থগিত

১৯৩০ সাল থেকে বিশ্বকাপ চালু হলেও মাঝে ১৯৪২ এবং ১৯৪৬ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে ফুটবলের বিশ্বযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হতে পারে নি।

বিশ্ব কাঁপে

এবার বিশ্বকাপের উত্তেজনার কাঁপুনিতে পিছিয়ে নেই ঠান্ডা পানীয় প্রস্তুতকারক সংস্থা কোকাকোলাও। তারাও হাজির করেছে বিশ্বকাপের লোগোযুক্ত ঠান্ডা পানীয়ের ক্যান।

বিশ্বকাপের বুড়ো

কয়েক মিনিটের জন্য মাঠে নেমে নজির গড়লেন কলম্বিয়ার পরিবর্ত গোলকিপার ফারিদ মন্দ্রাগন। গত ২৪ জুন জাপানের বিরুদ্ধে ম্যাচে কলম্বিয়া যখন ৩-১ গোলে এগিয়ে তখন খেলার শেষ পর্যায়ে পরিবর্ত গোলকিপার হিসেবে মাঠে নামেন মন্দ্রাগন। সঙ্গে সঙ্গেই তৈরি হয় নতুন রেকর্ড। মন্দ্রাগনের বয়স ৪৩ বছর ৩ দিন। এর আগে পর্যন্ত ক্যামেরুনের রজার মিল্লার দখলে ছিল এই রেকর্ড। বিশ্বকাপে নামার সময় রজার মিল্লার ৪২ বছর ৩৯ দিন। বিশ্বকাপে খেলতে পেরে গর্বিত মন্দ্রাগন।

গোওওওওল গপ্পো

এবারের বিশ্বকাপে গোল নাকি বেশি হচ্ছে! আমরা বরং দেখে নেই বিশ্বকাপের ইতিহাসে হ্যাটট্রিকের পরিসংখ্যান। এবারের বিশ্বকাপে ইতিমধ্যেই জার্মানির মুলার হ্যাটট্রিক করে জায়গা করে নিয়েছেন সেই তালিকায়। এখনও ৫০ জন ফুটবলার বিশ্বকাপে হ্যাটট্রিক করেছেন, তার মধ্যে হাঙ্গেরির সান্ডোর কোচসিস, ফ্রান্সের জাঁ ফঁতে, জার্মানির গার্ড মুলার এবং আর্জেন্টিনার গ্যাব্রিয়েল বাতিস্তুতা ২ বার করে বিশ্বকাপের আসরে হ্যাটট্রিক করার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

ফুটবলার	দেশ	প্রতিপক্ষ	সাল
বার্ট পাটেনাউডে	আমেরিকা	প্যারাগুয়ে	১৭-০৭-৩০
গিলেরমো স্ট্যাবিলে	আর্জেন্টিনা	মেক্সিকো	১৯-০৭-৩০
পেড্রো সিয়া	উরুগুয়ে	যুগোস্লাভিয়া	২৭-০৭-৩০
এডমন্ড কোনেন	জার্মানি	বেলজিয়াম	২৭-০৫-৩৪
অ্যাঞ্জেল শিয়াভিও	ইতালি	আমেরিকা	২৭-০৫-৩৪
ওল্ড্রিচ নেজেডলি	চেকোস্লোভাকিয়া	জার্মানি	০৩-০৬-৩৪
আর্নেস্ট উইলিয়ামৌস্কি	পোল্যান্ড	ব্রাজিল	০৫-০৬-৩৮
লিওনিডাস ড্য সিলভা	ব্রাজিল	পোল্যান্ড	০৫-০৬-৩৮
গুস্তাভ ওয়েটারস্টর্ম	সুইডেন	কিউবা	১২-০৬-৩৮
গুয়লা সেঙ্গেলার	হাঙ্গেরি	সুইডেন	১৬-০৬-৩৮
অস্কার মিগুয়েজ	উরুগুয়ে	বলিভিয়া	০২-০৭-৫০
মার্কেস ডি মেনেজেস	ব্রাজিল	সুইডেন	০৯-০৭-৫০
সান্ডোর কোচসিস	হাঙ্গেরি	দঃ কোরিয়া	১৭-০৬-৫৪
এরিখ প্রোর্বস্ট	অস্ট্রিয়া	চেকোস্লাভিকিয়া	১৯-০৬-৫৪
কার্লোস বর্জেস	উরুগুয়ে	স্কটল্যান্ড	১৯-০৬-৫৪
সান্ডোর কোচসিস	হাঙ্গেরি	জার্মানি	২০-০৬-৫৪
সার্জিন বুরহান	তুরস্ক	দঃ কোরিয়া	২০-০৬-৫৪
ম্যাক্স মর্লোক	জার্মানি	তুরস্ক	২৩-০৬-৫৪
জোসেফ হুজি	সুইজারল্যান্ড	অস্ট্রিয়া	২৬-০৬-৫৪
থিওডোর ওয়াগনেট	অস্ট্রিয়া	সুইজারল্যান্ড	২৬-০৬-৫৪
জাঁ ফঁতে	ফ্রান্স	প্যারাগুয়ে	০৮-০৬-৫৮
পেলে	ব্রাজিল	ফ্রান্স	২৪-০৬-৫৮
জাঁ ফঁতে	ফ্রান্স	জার্মানি	২৮-০৬-৫৮
ফ্লোরিয়ান আলবার্ট	হাঙ্গেরি	বুলগেরিয়া	৩০-০৬-৬২
ইউসেবিও	পর্তুগাল	গণঃ কোরিয়া	২৩-০৭-৬৬
জিওফ হার্স্ট	ইংল্যান্ড	জার্মানি	৩০-০৭-৬৬
গার্ড মুলার	জার্মানি	বুলগেরিয়া	০৭-০৬-৭০
গার্ড মুলার	জার্মানি	পেরু	১০-০৬-৭০
দুসান বাজেভিচ	যুগোশ্লাভিয়া	জাইরে	১৮-০৬-৭৪
আন্দর্জেজ জারমাচ	পোল্যান্ড	হাইতি	১৯-০৬-৭৪
রব রেনসেনব্রিঙ্ক	হল্যান্ড	ইরান	০৩-০৬-৭৮
তোফিলো কুবিলাস	পেরু	ইরান	১১-০৬-৭৮
লাজলোকিস	হাঙ্গেরি	এল সালভাদোর	১৫-০৬-৮২
রুমেনিগে	জার্মানি	চিলি	২০-০৬-৮২
বিগনিউ বোনিয়েক	পোল্যান্ড	বেলজিয়াম	২৮-০৬-৮২
পাওলো রোসি	ইতালি	ব্রাজিল	০৭-০৭-৮২
প্রেবেন লারসেন	ডেনমার্ক	উরুগুয়ে	০৮-০৬-৮৬
গ্যারি লিনেকার	ইংল্যান্ড	পোল্যান্ড	১১-০৬-৮৬
ইগর বেলানভ	সোভিয়েত ইউঃ	বেলজিয়াম	১৫-০৬-৮৬
এমিলিয়ো বুত্রাগুয়েনো	স্পেন	ডেনমার্ক	১৮-০৬-৮৬
মাইকেল	স্পেন	দক্ষিণ কোরিয়া	১৭-০৬-৯০
টমাস সুখরাভি	চেকোস্লোভাকিয়া	কোস্টারিকা	২৩-০৬-৯০
গ্যাব্রিয়েল বাতিস্তুতা	আর্জেন্টিনা	গ্রিস	২১-০৬-৯৪
ওলেগ সালেঙ্কো	রাশিয়া	ক্যামেরুন	২৮-০৬-৯৪
গ্যাব্রিয়েল বাতিস্তুতা	আর্জেন্টিনা	জামাইকা	২১-০৬-৯৮
মিরোস্লাভ ক্লোসে	জার্মানি	সৌদি আরব	০১-০৬-২০০২
পাউলেতা	পর্তুগাল	পোল্যান্ড	১০-০৬-২০০২
গঞ্জালো হিগুয়েন	আর্জেন্টিনা	দক্ষিণ কোরিয়া	১৭-০৬-২০১০
টমাস মুলার	জার্মানি	পর্তুগাল	১৬-০৬-২০১৪
জেহার্ডন সাকিরি	সুইজারল্যান্ড	হন্ডুরাস	২৫-০৬-২০১৪

এই তথ্য ২৫ জুন ২০১৪ পর্যন্ত।

ড্রাই ফিট

এটা কোনো ফিটনেস নয়, পর্তুগাল দলটি এই বিশেষ নামের বলা ভালো বিশেষ ধরনের জার্সি পড়েই বিশ্বকাপে খেলছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি এই জার্সি খেলার সময় তৈরি হওয়া খেলোয়াড়দের গায়ের ঘাম দ্রুত শুষে নিয়ে বাষ্পীভবন করতে পারে। ড্রাই ফিট জার্সিতে থাকা ছোটো ছোটো ছিদ্র দিয়ে সবসময় খেলোয়াড়কে বাতাসের শীতল পরশ দেবে। বিশ্বখ্যাত ক্রীড়া সামগ্রী নির্মাতা নাইকি এই বিশেষ জার্সি রোনাল্ডোদের জন্য নিয়ে এসেছে।

প্রো-কমব্যাট

খেলার সময় অতিরিক্ত দৌড়ঝাঁপের জন্য শরীর থেকে প্রচুর জল বেরিয়ে যায়, ফলে সমস্ত ফুটবলারদেরই পেশিতে টান ধরবার আশঙ্কা থাকে। এই আশঙ্কা কমাতে নাইকি মোজাতে ব্যবহার করছে প্রো-কমব্যাট রিকভারি হাইপার টাইট প্রযুক্তি। বিশেষ কাপড়ে তৈরি এই মোজা পড়ে মাঠে নামলে ফুটবলারদের পায়ের পেশিতে টান ধরার আশঙ্কা কমে, পেশির টান অনেকটা সারেও। এমনকি চোট থেকেও বাঁচিয়ে দেয় এই মোজা!

নজর চশমা

খেলার মাঠে বিক্ষোভ সামলাতে ব্রাজিলিয়ান পুলিশ ব্যবহার করছে এক বিশেষ ধরনের চশমা। এই চশমার মাধ্যমে পুলিশ নাকি সহজেই সন্দেহভাজন বিক্ষোভকারীকে সনাক্তকরতে পারবে। আসলে এই চশমায় থাকছে এক বিশেষ ধরনের ক্যামেরা। ব্রাজিলদের গোয়েন্দা দফতর এই ক্যামেরার পাঠানো ছবি থেকে প্রতি সেকেন্ডে ৪০০ মানুষের চেহারা কম্পিউটারে বিশ্লেষণ করে জানিয়ে দেবে কারা কারা সন্দেহভাজন। এক্ষেত্রে ব্রাজিল পুলিশকে সহায়তা দিচ্ছে ইন্টারপোল। আন্তর্জাতিক অপরাধীদের তালিকা ও ডেটাবেস ইন্টারপোল ও ব্রাজিল পুলিশ বিশ্লেষণ করেছে। এর ফলে বড়ো গণ্ডগোল এড়ানো সম্ভব হবে।

উধাও ফুলেকো

এবারের বিশ্বকাপের ম্যাসকট ফুলেকো প্রায় ব্রাত্য হয়ে এককোনায় ঠাঁই পেয়েছে। বেশিরভাগ ফিফার ক্যাম্পে নেই ফুলেকোর কোনো প্রতিকৃতি। ব্রাজিলের পরিবেশবিদরা রেগে আগুন। যদিও ফিফার পক্ষ থেকে পুরো বিষয়টিকে অস্বীকার করা হয়েছে।

আমেরিকার পিঁপড়ে রহস্য

আমেরিকা ১৮৬৯ সালের ৭ জুন এক অচেনা অজানা গ্রহর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন ডঃ জন কেলি। তিনি সেই অচেনা অজানা গ্রহ খুঁজে পেলেন অতি কষ্টে। সেখানে তিনি ৩২০দিন থেকে ছিলেন এবং তিনি ফেরার পথে সেখান থেকে সেই গ্রহের কিছু মাটি সংগ্রহ করলেন। তিনি যে সেটি একটি পোকা। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করলেন যে পিঁপড়েগুলি ২০ সেকেন্ড অন্তর ১ ইঞ্চি করে বাড়ছে এবং তিনি আরো দেখলেন যে সেগুলি পোকা নয় পিঁপড়ে। সেগুলিকে দেখতে মাথায় লাল শুঁড় পেছনে রসগোল্লার মত হুল তাই দেখে তিনি আনন্দে লাফিয়ে উঠে বললেন, তার মানে সেই গ্রহে প্রাণ আছে কিন্তু তিনি দেখলেন তারা তাড়াতাড়ি বংশ বৃদ্ধি করে ফেলছে এবং তাদেরকে যে কাচের জারে বন্দি করে রাখা হয়েছিল ২০ সেকেন্ড অন্তর অন্তর ১ ইঞ্চি করে বাড়ার ফলে সেটি জার ফাটিয়ে বেরিয়ে চলে এল। তাই দেখে বিজ্ঞানির মাথা ঘুরে গেল। এবং চোখ খুলতেই দেখলেন যে তার সারা বাড়ি পিঁপড়েতে ঢেকে গেছে। এবং তিনি লক্ষ্য করলেন যে পিঁপড়েগুলি দু'পায়ে হাঁটছে এবং তাকে ধরতে ৪টি পিঁপড়ে আসছে তখনই বিজ্ঞানী তাদের উপড় ফুলের টব ছুঁড়ে দেওয়ায় তারা মরে গেল। তখন বিজ্ঞানী বুঝতে পারলেন যে এদের পৃথিবীর মাটি সহ্য হয় না। এবার বিজ্ঞানী নিজেই তাদের মাটি ছুঁড়ে হত্যা করলেন।

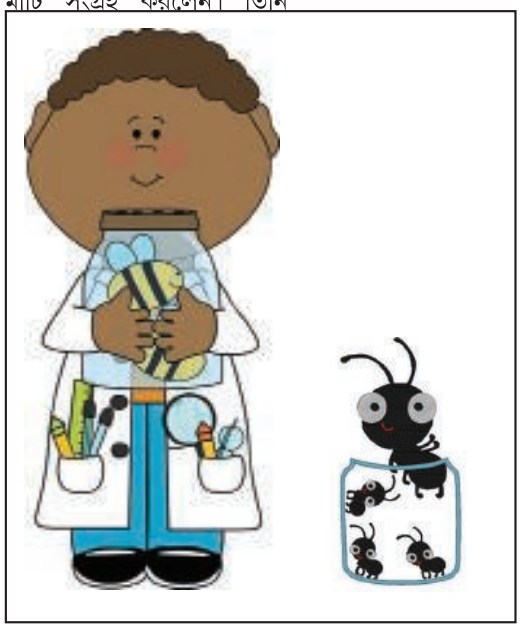

ঠিকঠাক পৃথিবীতে ফিরে এলেন কিন্তু তিনি পৃথিবীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলেন কারণ তিনি যে মাটি ওই গ্রহ থেকে এনেছিলেন সেখান থেকে পাওয়া গেল এক অজানা পোকা। প্রথমে ডঃ জন কেলি ভেবেছিলেন

সম্রাট সাহা
শ্রেণি : পঞ্চম
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম জে বি স্কুল

অদ্ভূত সিস্টেম

একি অদ্ভূত সিস্টেম,
দূষণ কমানোর জন এ
অদ্ভূত সিস্টেম
প্রথমে পেট্রলে চলা
অটো
তারপর গ্যাসে চলা
অটো
তারপর ব্যাটারিতে চলা
টোটো
তারপর দমদমাকে
ছোটো।

অরুণাভ মুখোপাধ্যায়
শ্রেণি : পঞ্চম
মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়

পাহাড়রানি দার্জিলিং

পাহাড়রানি দার্জিলিং
কানায় কানায় চা-বাগান
কমলালেবুর শেষ নেই
গন্ধে মম করে বাগান।
চারিদিকে প্রচুর বাগান,
ও ভাই,
দার্জিলিঙের এটাই তো শান
দার্জিলিঙে টয় ট্রেন
কাঞ্চনজঙ্ঘা পাহাড়,
ও ভাই দার্জিলিঙের
এটাই তো শান।

দেবজিৎ চট্টোপাধ্যায়
শ্রেণি : পঞ্চম
মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়

আঁকি-বুঁকি

রুদ্রনীল বোস
শ্রেণি - প্রথম,
নবনালন্দা বিদ্যালয়
কলকাতা

মেধা নাগ
শ্রেণি - দ্বিতীয়,
বেথুয়াডহরি শিশু বিদ্যামন্দির
বেথুয়াডহরি, নদিয়া

'কচি পাতা'র পাতায় পাঠাতে পারো তোমাদের লেখা ছড়া, অণুগল্প, লিমেরিক বা তোমাদের কোনো অভিজ্ঞতার কথা। আমরা গুরুত্ব দিয়ে ছাপবো সেই লেখা। পাঠাতে পারো ছবিও। লেখা ও ছবি পাঠানোর ঠিকানা -

কিচির মিচির

৯ কৈলাশ ব্যানার্জি লেন, হাওড়া - ৭১১ ১০১। পাঠাতে পারো ই-মেলেও।

মেলে দিলাম ইচ্ছেডানা

স্বপ্নে আমিই মেসি

সবাই জানে এখন ব্রাজিলে চলছে বিশ্বকাপ। খবরের কাগজের প্রথম পাতা মোটামুটি এখন মেসি, নেইমারদের দখলে। সত্যি কথা বলতে কি, আমি ফুটবল খেলা দেখা বিশেষত রাত জেগে দেখা পছন্দ করি না, খেলতেও খুব একটা ভালো লাগে না। কিন্তু আমার বন্ধু সৃজনের পাল্লায় পড়ে খেলা দেখতে বাধ্য হচ্ছি। নাহলে স্কুলে গিয়ে খেলা বিষয়ক আলোচনায় অংশ নিতে পারছি না। সেইরকমই একদিন অনিচ্ছা সত্ত্বেও খেলা দেখতে বসে আর্জেন্টিনার মেসিকে গোল করতে দেখলাম। দু'জনকে কাটিয়ে বলের দিকে চোখ রেখে বাঁ পায়ের জোরালো শট্ যখন বিপক্ষের গোলকিপারকে পরাস্ত করে জালে জড়িয়ে গেল তখন যে জায়গায় মেসি দাঁড়িয়েছিল সেই জায়গা থেকে কোনোমতেই গোল দেখা যাচ্ছিল না সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আর বলটিও যেন গায়ে ঠিকানা লিখে নিয়েছিল। গোলের কাছে অদ্ভুত বাঁক নিয়ে জালে জড়িয়ে যায়। গোলের পর মেসিকে নিয়ে সতীর্থদের নাচানাচি, গোটা স্টেডিয়ামের দর্শকদের উল্লাস, পাড়ায় বাজির আওয়াজ আমাকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। পরদিন সকালে প্রতিটি খবরের কাগজের প্রথম পাতায় শুধুই মেসি-বন্দনা, মেসি ম্যাজিকের বর্ণনা। রাতে শোওয়ার পর আমিও নাকি ঘুমের ঘোরে গোওওওওল বলে চিৎকার করে উঠেছিলাম। বাস্তব একদিনে কোনো মেসি বা নেইমার তৈরি হয় না। দীর্ঘ অনুশীলন এবং জয়ের মানসিকতাই তাঁদেরকে সাফল্য এনে দিয়েছে। আমি যদিও ফুটবল বাদ দিয়ে অন্য কিছুতে মনোযোগ দিয়ে কাজ করি তবুও বন্ধুদের পরামর্শ শুনে খেলা দেখতে বসে সত্যিই এবারের বিশ্বকাপ আমাকে স্বপ্নে মেসি করে তুলেছে।

শুভার্থী চক্রবর্তী
শ্রেণি : ষষ্ঠ,
ডানকুনি পাঠভবন,
ডানকুনি, হুগলি

তোমাদের জন্য এই প্রতিযোগিতা। প্রতি সংখ্যায় আমরা দেবো একটি কাল্পনিক বিষয়। তোমাদের কাজ হবে সেই বিষয়ের ওপর ২০০ শব্দের মধ্যে লিখে আমাদের দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া। চুপিচুপি বলে রাখি, বাবা-মা বা বড়োদের সাহায্য নিলেই কিন্তু আমরা বুঝতে পেরে যাবো। লেখা হলেই আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দাও। খামের ওপর লিখবে -

মেলে দিলেম ইচ্ছেডানা
প্রযত্নে - **কিচির মিচির,**
৯, কৈলাশ ব্যানার্জি লেন, হাওড়া - ৭১১ ১০১

পাঠাতে পারো ই-মেল করেও। আমাদের ই-মেল - kichirmichirkol@gmail.com। লেখা পাঠাতে হবে ফুলস্কেপ কাগজের একপিঠে। দু'পাশে যথেষ্ট ছাড় দিয়ে ৮ জুলাই-এর মধ্যে। নাম, ফোন নম্বর, ঠিকানা, বিদ্যালয়ের নাম, শ্রেণি পরিস্কার করে উল্লেখ করবে।

: প্রতিযোগিতার বিষয় :

বর্ষায় কাকভেজা

কিচির মিচির-এর পক্ষে রিমা ঘোষদস্ত কর্তৃক ৯, কৈলাস ব্যানার্জি লেন, হাওড়া - ৭১১ ১০১ থেকে প্রকাশিত এবং তাজ এন্টারপ্রাইজ, ৬ মণীন্দ্র মিত্র রো, কলকাতা - ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক : সুদীপ্ত চক্রবর্তী।
E-mail : kichirmichirkol@gmail.com, সম্পাদনা ও বিজ্ঞাপন : ৯৮৩০০৭৭২০৫/৯৩৩০৮০৮৯০০, বিপণন : ৮০১৭১৫৫৪১৭ Title registration - WBBEN14929/25/1/2014-TC.